জুন ২০২০ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মা-বাবা এবং সন্তানের দ্বৈরথ

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রকৃতির আহ্বান

মাহির ওয়াইজ মিয়েল, একাদ্বশ শ্রেণি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

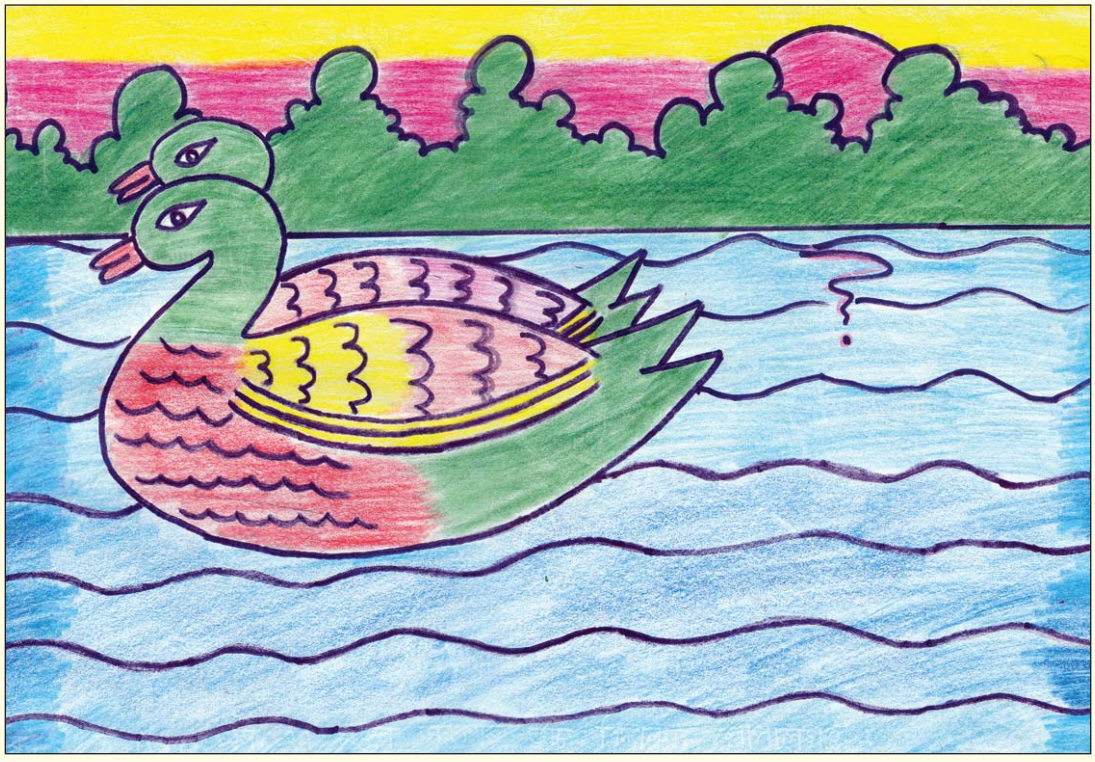

শুভ সরকার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, এস, এম মডেল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জুন ২০২০ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষ যখন আতঙ্কিত তখনই এসেছে আমাদের পবিত্র ঈদুলফিতর। এরই মধ্যে ঘরে বসেই আমাদের করতে হয়েছে ঈদ। কাজেই ঈদের আনন্দ সবাই মিলে, সবাইকে নিয়ে করা সম্ভব হয়নি। তবুও নবারুণের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি ঈদ মোবারক।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে 'এখনই সময় পরিবেশ বাঁচানোর' স্লোগান নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ।

করোনায় লকডাউনের কারণে শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ কমেছে। বেড়েছে সবুজের সমারোহ আর প্রাণ প্রকৃতির সাড়া। ঢাকাতেও এখন বিভিন্ন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে দেখা গেছে ডলফিন। যা হাজারো পর্যটকের ভিড়ে ঘটতো না। সুন্দরবনের হরিণগুলো আগের তুলনায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, এটি সারা পৃথিবীর চিত্র। প্রকৃতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্মল।

বন্ধুরা, তোমরা জানো আমাদের চারপাশে যা আছে তাই নিয়েই পরিবেশ। আসলে প্রত্যেকেই আমরা এই পরিবেশের অংশ। কাজেই, পরিবেশ ভালো না থাকলে আমরা কেউই ভালো থাকব না।

২১শে জুন বিশ্ব বাবা দিবস। করোনাকালীন এই বাবা দিবসে বিশ্বের সকল বাবাদের প্রতি রইল ভালোবাসা।

ভালো থেকো বন্ধুরা, ভালো রেখো তোমাদের পরিবেশ।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ মা-বাবা এবং সন্তানের দ্বৈরথ/ড. মোহাম্মদ হাননান
০৬ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রকৃতির আহ্বান
শাহানা আফরোজ
২১ আপনার সন্তানকে সময় দিন/ মো. জামাল উদ্দিন
৩৫ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস/মাহমুদা কামাল
৫০ অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাস/ওবায়দুল মুন্সী
৫৬ সকল বাবাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা/ মেজবাউল হক
৫৭ করোনা রোগীর পথ্য/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৯ এসএসসি'র ফলে মেয়েরা এগিয়ে/জান্নাতে রোজী
৬০ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও মে ২০২০ -এর সমাধান

ছোটোদের লেখা

৩৬ লকডাউনে আমার দিনলিপি/মুন্সী তাজীম মাহমুদ

ভিয়েতনামের লোককাহিনি

২৩ চাঁদের দেশের মানুষ/মাহমুদুর রহমান খাঁন

ভাষা দাদু

৩৩ অনুস্বার-বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু/তারিক মনজুর

ভ্রমণ

৫৪ মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত/রাকিব হাসান

গল্প

০৯ পুকুরটা দিঘি হতে চেয়েছিল/আহমেদ রিয়াজ
১৪ করোনা ভূত/রফিকুর রশীদ
১৭ লোকটার মাথায় সোনালি চুল/দেলোয়ার হোসেন
২৭ ম্যাজিক মশারি/ইমরুল ইউসুফ
৩১ রাজ হাতি ও শেয়াল পণ্ডিত/মুহাম্মদ বরকত আলী
৩৯ করোনার গল্প/ফারহানা আমিন(হৃদিতা)
৪১ ক্ষুদ্র হতে শিক্ষা/মো. মাঈন উদ্দিন
৪৪ মীনা যেভাবে প্রথম হয়েছে/সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্
৪৭ বোকার দেশে সফর/জুয়েল আশরাফ
৪৯ পলি ও হাঁসের ছানা/অনিক মাযহার
৫২ মিঠু জিঠুর বুদ্ধির খেল/জান্নাতা নিঝুম শিল্পী

কবিতা

০৮ মো. সামিন হোসেন/ আদনান হাবিব
১৩ আরিফুল ইসলাম মুকুল/ মঈনুল হক চৌধুরী
৩২ সখিনা খাতুন
৪২ মেশকাউল জান্নাত বিথি
আমিনুল ইসলাম কাইয়ুম/ এইচ এস সরোয়ারদী
৪৩ সরদার আবুল হাসান/ মুশফিক মিদুল
ইরফান হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: মাহির ওয়াইজ মিয়েল/ শুভ সরকার
২৯ ইশফাক কাদের
৪৬ মোছা. একি
৪৮ সামিউল হোসেন সামি
৪৯ শারিকা তাসনিম নিধি
৫১ সুহিন হোসেন
৫৫ সাফায়াত হোসেন
৬১ মো. জাওয়াদ হোসেন/ সাজিদ হোসেন

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

মা-বাবা এবং সন্তানের দ্বৈরথ

ড. মোহাম্মদ হাননান

'চুপ কর, তুই কী বুঝিস'-এমন একটা বাক্য আমাদের পারিবারিক মহলে খুব সুলভ। আর এ বাক্য ব্যবহারের সাথে সাথে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব তৈরি হয়ে যেতে থাকে। আর এ দূরত্ব পরবর্তীতে এতটাই বেড়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তা আর সামাল দেওয়া যায় না। হররোজ মা-বাবা এবং অভিভাবকরা সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন, যদিও তাদের দুশ্চিন্তা অমূলক নয়। তবে, এখানে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে। আর তা হলো দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্ব। বাবা-মা'র প্রজন্ম থেকে সন্তানের প্রজন্ম শাব্দিক অর্থেই যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। আর এ দূরত্ব প্রকৃত অর্থে বুঝতে না পেরে অভিভাবকগণ যেভাবে তা সামলে নিতে চাচ্ছেন, তাতে দূরত্বটা আরো বেড়ে যাচ্ছে, বেড়ে যায় প্রতিনিয়ত।

একটা বিষয় মা-বাবাকে উপলব্ধি করতে হবে, আজকের প্রজন্ম নেতিবাচক কথা এবং তার নিজের অথবা অন্যের সমালোচনা খুব বেশি নিতে পারে না। তাই মা-বাবাকে খুব সচেতন থাকতে হবে। 'এই বেকুব কোথাকার, তুমি একটা বোকার হাড্ডি, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না'–এ ধরনের কথা শুনলে সন্তানরা খুব মুষড়ে পড়ে। তাই এমন কথা বলে সন্তানকে হতোদ্যম করা যাবে না। বলতে হবে, 'আরে দুষ্টু, আরেকটু বুদ্ধি খাটা না। দেখবি তুই পারবি, তুই-ই পারবি'।

আবার সন্তানকে আমরা কখনোই চাপে ফেলে দেব না। ভালো কিছু করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। 'তোকে এটা করতেই হবে'-এমনটা না বলে বলতে হবে 'তুমি যদি এটা করতে পারো তাহলে আমি তোমাকে একটি সুন্দর উপহার তো দেবোই, সঙ্গে আর যা যা চাইবে, তাও পাবে।' একটা কিছু করার জন্য তার কাছে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে চাপে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তাকে বরং উদ্বুদ্ধ করতে হবে ভালো কিছু করতে, আরো এগিয়ে যেতে।

সন্তানকে বাস্তবতা শেখাতে হবে। বলতে হবে 'তুমি যত বড়ো হচ্ছো, তোমার স্বপ্নগুলো কিন্তু দিন দিন ছোটো হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে এমনভাবে আগাতে হবে, যেন হতাশা তোমাকে ছেয়ে ফেলতে না পারে। এটা হয়নি তো কী হয়েছে, এর চেয়ে ঢের পেছনে থেকে মানুষ আরো বড়ো সাফল্য নিয়ে এসেছে! তোমার জীবনেও দেখ এমনটা ঘটবে।'

সন্তান যেন সাহস পায়। মা-বাবা সবসময় সন্তানকে শুধু স্বপ্ন দেখাতেই শেখাবে না, বিশ্ব পরিস্থিতি, দেশ-সমাজের হালচিত্র তার কাছে তুলে ধরবে। ইদানীং ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার কাজ অনেক কঠিন হয়ে গেছে। এ নিয়ে খুব চাপের মধ্যে থাকে আমাদের সন্তানরা। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ না পেলে পিতা-মাতাকে এখন এজন্য সন্তানকে দোষারোপ করলে হবে না। 'আমি জানতাম এমনটা হবে, তোর তো খুব ভালো প্রস্তুতি ছিল না। সারাদিন আড্ডা মেরেছিস, আর মোবাইলে সারাক্ষণ বসে মেতেছিস। এ হলো তার ফল। দেখ অমুকের ছেলে খুব ভালো, কেমনভাবে চান্স পেয়ে গেল।' এসব পিতা-মাতা'র বচন হতে পারে না। মনে রাখতে হবে আজকের বর্তমান এই প্রজন্ম 'তুলনা' পছন্দ করে না। তুলনার মতো ব্যাপারগুলো তারা খুব নেতিবাচকভাবে নেয়। বরং সন্তানদের দুঃসময়ে তার পাশে দাঁড়ানোটাই বাবা-মা'র বড়ো কাজ। বলতে হবে, 'ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিংই একমাত্র পেশা নয়, যা মানুষকে বড়ো করে তুলবে। তুমি বিজ্ঞানের অন্য শাখায় পড়, বিজ্ঞানী হওয়ার সুযোগটা তো তোমার রয়েই গেছে'। অথবা 'তুমি সাধারণ বিষয়গুলোও পড়তে পার। তখন তুমি সিভিল সার্ভিসেও যোগদান করতে পারবে'। কিংবা বলা যায়, 'তুমি একজন ভালো উদ্যোক্তা হও, বর্তমান সময়ে সৃজনশীলতার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অংশ হচ্ছে উদ্যোক্তা হওয়া'। এমনি করে সন্তানের মনের সাহসকে বাড়িয়ে দিতে হবে, আর তা করতে পারে কেবল পিতা-মাতাই।

ইদানীংকালের ব্যস্ত সময়ের জীবনে সন্তান পালনে বাবা-মা'কে আরো মনোযোগী হতে হবে। আমাদের বর্তমান সমাজ, সংসার, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সন্তানদের ব্যক্তি জীবন। ২০১৭ সালের এক জরিপে বেরিয়ে এসেছে, '৫৩ শতাংশ শিশু-কিশোর মনে করে, মা-বাবা তাদের কথা বুঝতে পারেন না'। ['তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ-এর দেয়া তথ্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলিং ইউনিট, ঢাকা, ১৩ই অক্টোবর, ২০১৯]। এ তথ্যটি আমাদের কী বার্তা দেয়? বার্তাটি বলে, বাবা-মা'র মধ্যে সন্তানদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। পিতা-মাতারা এখন আর শুধু সন্তানদের সময় দিতে চান না, অথবা চাইলেও পারছেন না ব্যস্ততায় এবং জীবনের চাপে।

অথচ আমাদের সন্তানরা আমাদের অভিভাবকদের কাছে কী চায়। তারা চায় তাদের পিতা-মাতা তাদের সঙ্গে একটু সময় কাটাক, তাদের সঙ্গ দিক, তাদের পড়ালেখা করার প্রয়োজনে পিতা-মাতাও একটু আধটু তাদের সঙ্গে পড়াশুনা করুক, একটু খেলুক। বাবা-মা'র সঙ্গে একটি গল্পের বই তারা আনন্দের সঙ্গে মিলে-মিশে পড়তে চায়। বাবা-মা'র নিজেদের জীবনেরই অনেক গল্প থাকে, সন্তানরা সেগুলো শুনতে চায়। কিন্তু অনেক বাবা-মা তাদের ব্যক্তিগত সুখ এবং প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এদিকে পা বাড়াতে চান না। আমাদের বাবা-মা অনেক ক্ষেত্রে আরো আরো উপার্জন করতে যতটা বাইরে কাটান, আসলে ব্যক্তিজীবনে এত উপার্জন করার প্রয়োজন নেই সন্তানদের বঞ্চিত করে। আমাদের সন্তানরা অনেক একা। তারা বাবা-মায়ের গায়ের গন্ধ নিতে চায়, তাদের স্পর্শ করতে চায়, তাদের নিয়ে একসঙ্গে একটু হাসতে চায়, ঠাট্টা-কৌতুকে আনন্দ ভাগ করে নিতে চায়। কিন্তু আমাদের অনেক অভিভাবকই হয়ত জীবনের প্রয়োজনে উলটো পথে হাঁটেন। তাদের নিজেদের সুখ-আনন্দ, ইচ্ছা, পদ-পদবির লোভ, আরো সম্পদ বাড়ানোর প্রবণতা এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন আমাদের সন্তানদের সময় দেয়ার মাঝে।

বাবা-মা'দের ভুলে গেলে চলবে না পরিবারই সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড়ো শক্তি। আমরা সেই পরিবার প্রথা শিথিল করে দিচ্ছি কেন! কেন আমরা প্রতিদিন অন্তত একটা সময় পারিবারের সকল সদস্য একত্রে বসে সময় কাটাতে পারি না? রাতে অন্তত সবাই একসঙ্গে একই সময়ে বসে খেতে পারি! সে সময় পরিবারের কার কী সমস্যা, আগামীকাল কার কোথায় বিশেষ কাজ আছে, কোনো কেনা-কাটা আছে কিনা, কোনো আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানো অথবা বিয়ের অনুষ্ঠানে সবাই মিলে যাবে কিনা, কাকে কী উপলক্ষ্যে কী উপহার পাঠানো যায় ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শগুলো সেরে ফেলা যায়। এ সময় আজ কে কী কাজ করেছি, কোথায় গিয়েছি, কী খেয়েছি, সে সম্পর্কে কথা বলতে পারি। এতে পারিবারিক সম্প্রীতিও বাড়বে এবং বাবা-মা'র সঙ্গে সন্তানদের দূরত্বও কমে আসবে, সবার নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। বাবার সঙ্গে মা'র, মা'র সঙ্গে বাবার সম্পর্কও এতে দৃঢ় হবে। সন্তানদের মধ্যে এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শৈশব থেকেই তারা বুঝে উঠবে, যে কোনো কাজ করার আগে, সবার সাথে পরামর্শ করে নিতে হয়। এতে ফল ভালো হয়। সন্তানরা তাদের মনের আসল কথা খুলে বাবা-মা'র সঙ্গে যে–কোনো বিষয় যে–কোনো সমস্যা শেয়ার করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। আমাদের সন্তান আমাদের জন্য দূরের মানুষ বা অপরিচিত কেউ না হয়ে কাছের মানুষ হবে।

আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সন্তানদের সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক কখনো যেন দ্বৈরথ তৈরি না করে এবং সে উদ্যোগটা বাবা-মা'র থেকেই থাকতে হবে। সন্তানদের সকল ব্যাপারেই বাবা-মা সতর্ক থাকবেন, কিন্তু আড়ি পাতবেন না। গোপন ক্যামেরায় সন্তানদের গতিবিধি পরখ করবেন না। সন্তানের কাছে নীতিকথা বলতে হবে, কিন্তু তার আগে বাবা-মা'কেও নীতিবান হতে হবে। আর তা না হলে সন্তান তা মেনে নিতে চাইবে না। সন্তানকে আগে অন্যান্য শিশু-কিশোরদের সঙ্গে শিখতে দিতে হবে। বাবা-মা অভিভাবক, পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও তাদের সাথে মিশার; নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। তবেই আমাদের সন্তানরা হবে বিকশিত এবং আনন্দে ভরপুর, বিকশিত হবে আমাদের সমাজ সুন্দরভাবে। ■

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রকৃতির আহ্বান

শাহানা আফরোজ

সারা পৃথিবী জুড়ে ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day) পালিত হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হলো পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৯৬৮ সালের ২০শে মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। সে বছরই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ই জুন জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি ইতিহাসের প্রথম পরিবেশ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৩ সালে সম্মেলনের প্রথম দিন ৫ই জুনকে জাতিসংঘ বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

মানুষ ও পরিবেশ পৃথিবীর অঙ্গ। জলবায়ু, পরিবেশ এবং মানুষ একে অপরের সঙ্গে জড়িত। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কিছুই পায় পরিবেশ থেকে। আবার এই মানুষই তার প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে সব থেকে বেশি ক্ষতি করে পরিবেশের। মানুষ যতই আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে, পরিবেশের উপরে ততই চাপ পড়ছে। বাড়ছে কলকারখানার কালো বিষাক্ত ধোঁয়া এবং বর্জ্য। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য, বাসস্থান এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বিলুপ্ত হচ্ছে বনাঞ্চল, নদী-নালা, খাল-বিল। সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হচ্ছে এসব স্থানে বসবাস করা বিভিন্ন ধরনের ছোটো বড়ো বন্যপ্রাণী।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচারের (আইইউসিএন) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ৩১ হাজার জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে, যা মোট প্রজাতির শতকরা

২৭ ভাগ। জীববৈচিত্র্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারার কারণে আমরা মানবজাতি বুঝে বা না বুঝে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছি সব থেকে বেশি। আর যেন দেরি না হয় প্রকৃতি যেন ফিরে আসে নিজ রূপে এই কামনা করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

চলতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'টাইম ফর নেচার'। এবারের প্রতিপাদ্য অন্যান্য বছর থেকে আলাদা। বিশ্বব্যাপী মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বড়ো সংকটের বিষয়কে সামনে রেখে, জীববৈচিত্র্য রক্ষার যে তাগিদ দুনিয়াব্যাপী আলোচিত হচ্ছিল মানুষের অতি প্রয়োজনীয়তা তাতে বাধ সাধছিল। মানুষের সেই অতিপ্রয়োজনীতা কমিয়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস -এর প্রতিপাদ্য সবার জন্য নতুন আঙ্গিকে ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এবার পরিবেশ দিবসের আয়োজক দেশ কলম্বিয়া। জার্মানির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তারা।

কোভিড-১৯ এর তাণ্ডবে সারাবিশ্বের মানুষ যখন বিপর্যস্ত তখন প্রকৃতিতে ফিরেছে প্রাণ। গত ডিসেম্বর মাস থেকে পৃথিবীর মানুষ একপ্রকার ঘরবন্দি। এই সুযোগে প্রকৃতি যেন নিজেকে মেলে ধরেছে। ফিরেছে স্বমহিমায়। এই বাস্তবতা থেকে নতুন করে শিখতে শুরু করেছে মানুষ। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আমরা জীববৈচিত্র্য রক্ষা করলে শুধু খাদ্যেরই যোগান পাব না বরং ওষুধসহ নির্মল পানি এবং বাতাস পাব। যা মানুষের সুস্থতার বড়ো অনুষঙ্গ হতে পারে। পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্দয় আচরণ না করে সংরক্ষণ করলে অনেক রোগব্যাধি ও ভাইরাস থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া সহজতর হতো।'

লকডাউনের এই সময় আমরা প্রকৃতির দিকে একটু তাকালেই বুঝতে পারি কতটা পরির্তন হয়েছে। তোমরা হয়ত অনেকেই খেয়াল করেছ তবু কিছুটা জেনে নাও। ঢাকার বাতাসে যেমন কমেছে সিসার বিষ, তেমনি শব্দের দূষণও কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বের বায়ুমান যাচাই বিষয়ক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'এয়ার ভিজ্যুয়াল' এর বায়ুমান সূচকে (একিউআই) বাংলাদেশের অবস্থান ৭৩ তমতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সূচকের মান জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে যেখানে ছিল ৩০০ এর উপরে। যা শুধু অস্বাস্থ্যকর নয়, দুর্যোগের পর্যায়ে মনে করতেন বিশেষজ্ঞরা। সেখানে এখন সেই সূচক নেমে এসেছে ৫০ এর নিচে।

রাজধানীর কয়েকটি সড়কের পাশে ফুটেছে লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বন্ধ দেশের বেশিরভাগ অফিস-আদালত, ব্যবসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণপরিবহন। ফলে সারা দেশের প্রকৃতিতে বিরাজ করছে সুনশান-নীরবতা। মানিক মিয়া এভিনিউ সড়ক, মিরপুর ও বিমানবন্দর সড়কের বেশ কয়েকটি স্থান, রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেন ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের কৃষ্ণচূড়া গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে লাল ফুল। প্রতি বছর থেকে এবারের কৃষ্ণচূড়া গ্রীষ্মের রুক্ষতা ছাপিয়ে সবুজ চিরল পাতার মাঝে যেন আগুন জ্বালিয়েছে।

সবুজে বদলে গেছে মেগা সিটি ঢাকা। দূষণ নেই। নেই কর্কশ শব্দ। নেই গাড়ির কালো ধোঁয়া। বাতাসে নেই ভারী সিসা। কোথাও দেখা যায় না ধুলাবালি। ফুরফুরে বাতাসে তরতর করে বেড়ে উঠছে সড়কদ্বীপের গাছ-গাছালি। পথ বিভাজনে সংসারপাতা ফুলগুলো কত রঙিন দেখতে! কোনোটি লাল, কোনোটি হলুদ, কোনোটি বেগুনি। কোথাও কোথাও কুঁড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুল। অন্যরকম এক আবেশ ছড়াচ্ছে বর্তমান রাজধানীর প্রকৃতি। রং-বেরঙের প্রজাপতিও উড়ছে!

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এ পর্যটক কিংবা স্থানীয়দের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই সৈকতের দূষণ একেবারেই কমে গেছে। পর্যটকশূন্য কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের কলাতলী পয়েন্টে সাগরের নীল জলে বিরল

ডলফিন দলের খেলা দেখা গেছে। যা গত ৩ দশকে কখনো দেখা যায়নি।

অগণিত সাদা বকের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে রাজধানীর উপকণ্ঠের জাতীয় উদ্যান বোটানিক্যাল গার্ডেন। কাক-ভোরে শত শত বকের ডাকাডাকিতে মুখরিত হয় পুরো এলাকা। গার্ডেনে দর্শনার্থী প্রবেশ নিষিদ্ধ ২৫শে মার্চ থেকে। এ সময় প্রকৃতির পরিবেশ বেশ শান্ত। বড়ো বড়ো গাছে তাই এসব বকের অবস্থান। এর মধ্যে কোকিলের কুহু কুহু ডাক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মনে আনন্দের দোলা দিচ্ছে। বাগানের কয়েক হাজার গাছগাছালিতে শত শত নাম না জানা পাখির আগমন ঘটেছে। বুলবুলি, ময়না, টিয়া, ঘুঘু, সাদা বক, কানি বক, মাছরাঙা, শালিক, ছাতারে, মুনিয়া, শ্যামা ও কোকিল অন্যতম। রয়েছে অতিথি পাখির দল। এ তালিকায় বাদ যায়নি ঈগল ও শকুন নামের বড়ো বড়ো পাখি। আর লেকের জল ও পদ্ম পুকুরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ডাহুক। পাশাপাশি কমপক্ষে কয়েক প্রজাতির শতাধিক বানরের নতুন আশ্রয়স্থল হয়েছে সরকারি এ উদ্যানটিতে। বনের বাঁশঝাড় এলাকায় দেখা মেলে ছোটো ও বড়ো বানরের আনন্দ নাচন। রয়েছে কয়েক প্রজাতির সাপ। পাশাপাশি গোলাপ বাগান এলাকায় দেখা গেছে লাল, কালো, হলুদ, সবুজ ও সাদা গোলাপ ফুলের সমাহার। এসব দৃশ্য দেখে একমুহূর্তে মন আনন্দে ভরে যাবে।

দিনাজপুরের বন্ধ স্কুল ক্যাম্পাসে কোলাহলমুক্ত পরিবেশে প্রকৃতি সেজেছে নতুন সাজে। চারদিকে লাল সবুজের সমারোহ। স্কুল ক্যাম্পাসের জলজ কর্নার শাপলার অভয়রাণ্যে পরিণত হয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকায় গাছে গাছে গোলাপসহ নানান ফুলে ফুলে ভরে আছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

প্রকৃতি পরিবর্তনগুলো আমাদের নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোর কারণ অনুধাবন করে একটু সচেতন হলেই আমরা প্রকৃতিকে তার স্বকীয়তায় বিকশিত হতে সহায়তা করতে পারি। ■

সবুজায়ন

মো. সামিন হোসেন

সবাই মিলে গাছ লাগাব
গড়ব সুন্দর পরিবেশ
সবুজে সবুজে ভরে যাবে
আমার সোনার বাংলাদেশ।
ফল-ফুল-ঔষধি গাছ
লাগাব রয়েছে আরো যত
বাড়ির আশপাশ ছাড়াও
খালি জায়গা আছে যত।

৮ম শ্রেণি, কুমিল্লা জেলা স্কুল, কুমিল্লা

ফলের ছড়া

আদনান হাবিব

ফলের রাজা আম
দেশ জোড়া তার নাম
মুখ লাল করে জাম
রক্ত হবে দাম
রসে ভরা লিচু
মাছি ছাড়ে না পিছু
জাতীয় ফল কাঁঠাল
আঠায় টাল মাটাল
তরমুজের জুস
আহা কি সুখ
মধুমাসে মধু ফল
খাও-দাও বাড়াও বল।

৫ম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

পুকুরটা দিঘি হতে চেয়েছিল

আহমেদ রিয়াজ

আমাদের একটি পুকুর আছে। টলটলে তার পানি। পুকুরের পারে যেসব গাছ আছে, সেসব গাছের ছায়া পড়ে পুকুরে। আকাশে মেঘ উড়ে উড়ে যায়, সে মেঘের ছায়া পড়ে আমাদের পুকুরে। আমাদের এই পুকুরেও সূর্য ওঠে, আবার সূর্য ডুবেও যায়। তবে তা অল্প সময়ের জন্য। পুকুরের টলটলে পানিতে যখন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে গাছের ওপর পড়ে, আর পুকুরের পানি যদি তখন হালকা বাতাসে কাঁপতে থাকে, তখন সেই প্রতিফলিত আলোও নাচতে থাকে। কী দারুণ লাগে সেটা দেখতে! এই পুকুরে চাঁদও ওঠে। পুকুরে চাঁদের যে আলো পড়ে, সেটাও প্রতিফলিত হয়। জোছনা রাতে ওই চাঁদের আলোয় চারপাশ ঝকমক করে। ওই পুকুরে যেসব মাছ আছে সেগুলো উপর থেকে দেখা যায়। তবে খুব গভীরে আবার দেখা যায় না। আমাদের পুকুরে পানি পান করতে আসে হাঁসেরা। পানি পান শেষে ওরা পুকুরে মনের সুখে সাঁতারও কাটে। কোনো কোনো গরমলাগা দুপুরে একঝাঁক কাক আর শালিক এসে গোসল করতে নামে পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। আমাদের পুকুরটা আমার কাছে একখণ্ড ছোট্ট পৃথিবী। আমি প্রায়ই পুকুরের পারে এসে নরম ঘাসের উপর বসি। তারপর তাকিয়ে থাকি পুকুরের টলটলে পানির দিকে। কোনো কোনো দুপুরে পুকুরের সাথে আমার কথাও হয়। আমি আলতো করে শুধাই, 'কেমন আছ শান্ত পুকুর?'

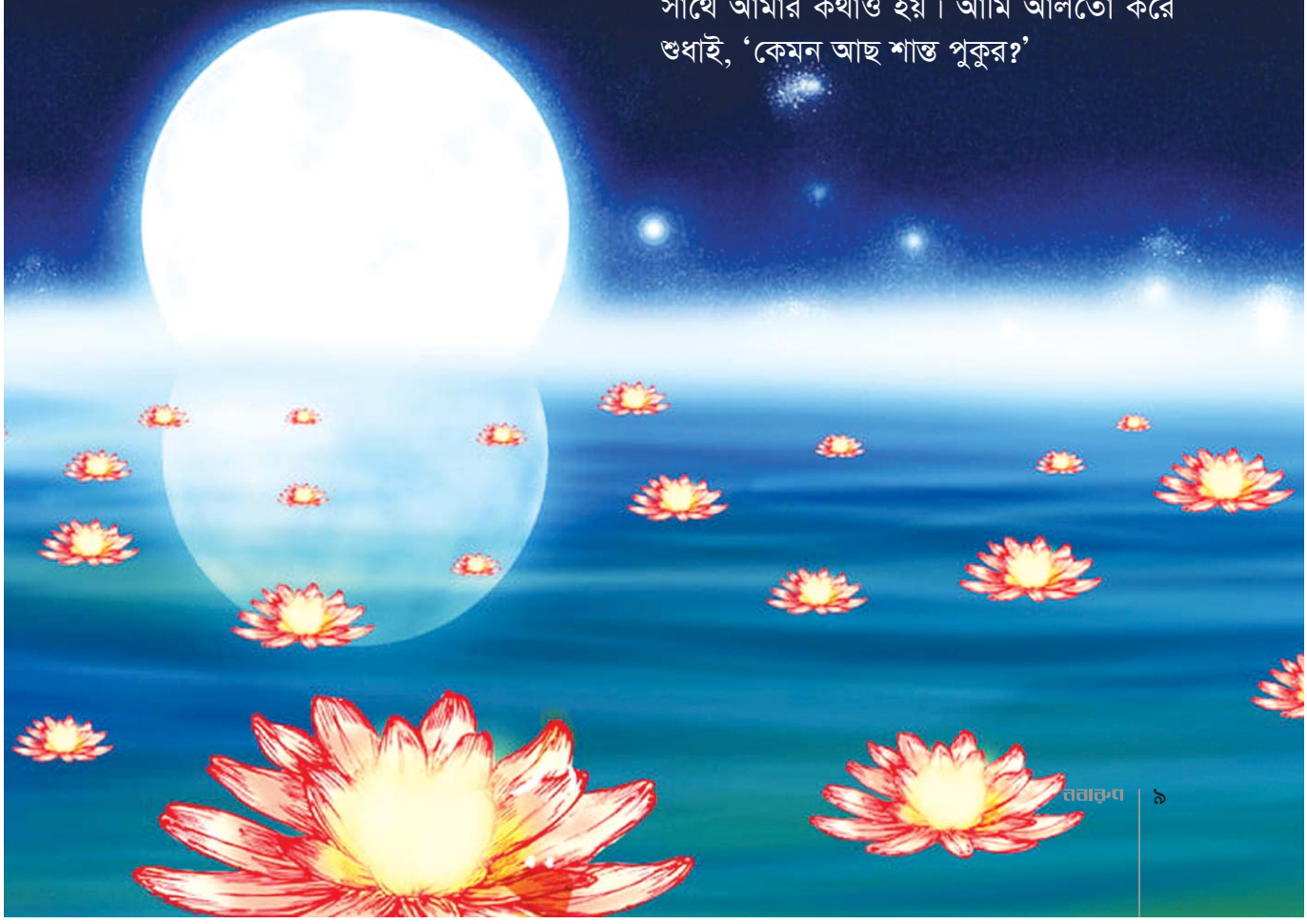

আশপাশে কেউ না থাকলে পুকুরটা জবাব দেয়, 'শান্ত পুকুর! আমাকে তুমি শান্ত পুকুর বললে?'

আমি বলি, 'তুমি তো শান্তই। কোনো হইহল্লা নেই। নিজের মতো আছ। আকাশ দ্যাখো, মেঘ দ্যাখো, সূর্য দ্যাখো, চাঁদ দ্যাখো। তোমার বুকে সবাইকে সাঁতার কাটতে দাও। তোমার মতো শান্ত আর কে আছে বলো?'

পুকুর বলে, 'এটাই আমার পৃথিবী।'

একদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তুমি কি আর বড়ো হতে চাও?'

পুকুর জবাব দিয়েছিল, বড়ো হতে কে না চায়? তুমি চাও না?'

আমি বললাম, 'আমি তো এমনিতেই বড়ো হচ্ছি। কিন্তু তুমি তো আর এমনি এমনি বড়ো হতে পারবে না। পারবে?'

পুকুর বলল, 'তা পারব না।'

আমি বললাম, 'তুমি কি আর বড়ো হতে চাও?'

পুকুর বলল, 'চাই।'

আমি বললাম, 'কার মতো?'

পুকুর বলল, 'অনেকের কাছে শালিক দিঘির নাম শুনেছি। দেখতে নাকি খুব সুন্দর। আমি ওই শালিক দিঘির মতো বড়ো হতে চাই।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি কখনো সুযোগ পেলে তোমাকে শালিক দিঘির মতো বড়ো করে ফেলব।'

একদিন আমাদের ভূগোল টিচার আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'বল তো পৃথিবী দেখতে কেমন?'

আমি তখন পুকুরের চিন্তায় অস্থির। কেমন করে ওকে দিঘি বানানো যায়। কিন্তু কথাটা কাকে বলব? বললে সবাই কী ভাববে? দিঘি কি পুকুরের মতো গোল হয়? আমাদের পুকুরটা তো গোল। সুন্দর গোল। মনে হয় বিশাল একটা কম্পাস দিয়ে আগে দাগ টেনে তারপর পুকুরটা কাটা হয়েছে। আমি আনমনেই জবাব দিলাম, 'গোল।'

টিচার বললেন, 'বেশ বলেছিস। এবার বল তো কার মতো গোল?'

চটপট জবাব দিলাম, 'আমাদের পুকুরের মতো।'

আমার কথা শুনে সারা ক্লাসে হাসির তুফান ওঠল। মনে হলো যেন হাসির প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এমনকি আমাদের ভূগোল টিচারও ওই প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছেন। তাঁর পান খাওয়া লাল লাল দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলাম না এতে হাসির কী হলো। জানতে চাইলাম, 'সবাই হাসছে কেন টিচার?'

টিচার বললেন, 'তোর কথা শুনে।'

বললাম, 'আমি কি ভুল কিছু বলেছি?'

টিচার বললেন, 'পৃথিবী কি তোদের পুকুরের মতো গোল? বইতে কী লেখা আছে?'

বললাম, 'আপনারা আমাদের পুকুর দেখেননি তো, তাই হাসলেন। আমাদের পুকুর দেখলে আর হাসাহাসি করতেন না।'

আমার কথায় বেশ মজা পেয়ে গেলেন টিচার। বললেন, 'তা-ই নাকি! তাহলে তো তোদের পুকুর দেখতে যেতে হয়।'

উৎসাহ পেয়ে বললাম, 'কবে যাবেন?'

টিচার বললেন, 'আগে বাজারে কমলালেবু উঠুক। তারপর যাব।'

অবাক হয়ে বললাম, 'এখানে আবার কমলালেবু এল কেন?'

টিচার বললেন, 'আমরা পড়েছি পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল। তোদের ভূগোল বইতেও সেটা লেখা আছে। কিন্তু তুই বলছিস পৃথিবী তোদের পুকুরের মতো গোল। পৃথিবী তুলে নিয়ে তো আর তোদের পুকুরের সাথে মিলিয়ে দেখা যাবে না! তাই কমলালেবু নিয়ে মিলিয়ে দেখব তোদের পুকুর কমলালেবুর মতো গোল কি না।'

আবারও হাসির একটা জোয়ার ওঠল ক্লাসে। টিচার এবার সবাইকে ধমক দিয়ে বললেন, 'থাম সবাই। পৃথিবী কেবল কমলালেবুর মতো গোল হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীতে আছে এমন অনেক কিছুর মতোই গোল হতে পারে পৃথিবী। পৃথিবীর আকৃতির দখল কেবল কমলালেবুর একার নয়।'

খুব খুশি হলাম টিচারের কথা শুনে। সেদিনই স্কুল

থেকে বাসায় ফেরার পথে দেখা করে গেলাম আমাদের পুকুরের সাথে। পুকুরকে বললাম, 'তুমি কিন্তু দেখতে পৃথিবীর মতো।'

পুকুর জানতে চাইল, 'পৃথিবী কী?'

'আমরা যে গ্রহে বাস করি সেটাই পৃথিবী।'

'গ্রহ কী?'

বললাম, 'এত কিছু জানতে হলে তো তোমাকে স্কুলে যেতে হবে। যাবে স্কুলে?'

'নাহ্! আমাকে কেবল দিঘি বানিয়ে দিলেই হবে।'

একদিন সুযোগ বুঝে বাবাকে বললাম, 'বাবা আমাদের একটা দিঘি থাকলে ভালো হতো।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'দিঘি দিয়ে কী হবে?'

বললাম, 'দিঘির পারে হাঁটাহাঁটি করা যাবে।'

'পুকুর পারেই তো হাঁটাহাঁটি করতে পারো।'

'কিন্তু পুকুরের পার অনেক ছোটো।'

বাবা এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসল কথাটা বলে ফ্যালো।'

বললাম, 'আমাদের টলটলে পুকুরটার দিঘি হওয়ার খুব শখ। ওকে কী দিঘি বানিয়ে দেয়া যায় না?'

বাবা বললেন, 'তুমি কেমন করে বুঝলে ওর দিঘি হওয়ার শখ?'

'পুকুরটা আমাকে বলেছে।'

বাবা এবার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'পুকুর তোমাকে বলেছে!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বাবা। পুকুর আমাকে বলেছে। আমি নিজে শুনেছি। একদিন দুপুর বেলা আমি...'

আমাকে আর কথা বলতে দিলেন না বাবা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কি লেখাপড়ার খুব চাপ যাচ্ছে?'

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'কেন?'

'মনে হচ্ছে। আচ্ছা আমি স্কুলে বলে দিচ্ছি, তোমাকে যাতে সাতদিনের ছুটি দেয়। এই সাতদিন তুমি তোমার ইচ্ছে মতো ঘোরাঘুরি করবে। তোমার যা ইচ্ছে তা-ই করবে।'

আমি বললাম, 'এই সাতদিনে তাহলে পুকুরটাকে দিঘি বানিয়ে দাও বাবা।'

বাবা বললেন, 'পুকুরটা যেদিন আমাকে নিজে বলবে, আমি সেদিন থেকেই ওকে দিঘি বানানো শুরু করব।'

বাবার কথায় খুব খুশি হয়ে গেলাম আমি। একছুটে চলে গেলাম পুকুরের কাছে। পুকুরকে ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি তোমার ইচ্ছের কথা বাবাকে বলো।'

আশপাশে তখন আর কেউ ছিল না। তাই কথা বলে উঠল আমাদের পুকুর। বলল, 'তোমার বাবাকে আমি বলতে পারব না। সবাইকে সব কথা বলা যায় না।'

'কেন বলা যায় না?'

পুকুর বলল, 'পুকুরের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, এটা বড়োরা জানেই না। কেবল তোমার মতো যারা, তারাই কথা বলতে জানে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বাবার সাথে কথা বলে দেখেছ?'

'দেখেছি। কিন্তু আমার কথা বুঝতেই পারেননি।'

বললাম, 'তাহলে তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে না?'

পুকুর বলল, 'কেন হবে না? তুমি যখন বড়ো হবে, তখন আমার ইচ্ছে পূরণ করবে!'

খুশি হয়ে বললাম, 'তাহলে তা-ই হবে।'

পুকুর জানতে চাইল, 'বড়ো হয়ে আবার আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

আমি বললাম, 'কক্ষনো না।'

'মনে থাকে যেন। বড়ো হলে অনেকে অনেক কিছু ভুলে যায়। তোমার বাবাও কিন্তু তোমার মতো থাকতে ঠিক এমন করে কথা বলেছিল আমার সাথে। বলেও ছিল আমাকে দিঘি বানিয়ে দেবে। এখন ভুলে গেছেন।'

'আমি বাবার মতো ভুলে যাব না।'

'তোমার দাদুও সেই ছোট্টটি থাকতে তোমার মতো আমার সাথে গল্প করত। এখন জিজ্ঞেস করে দেখো, কিছুই মনে করতে পারবে না।'

আমি বেশ অবাক হলাম। কী বলে পুকুরটা! জানতে চাইলাম, 'তাহলে তোমার এই ইচ্ছে অনেকদিন ধরে?'

পুকুর বলল, 'অনেকদিন কেবল নয়, অনেক বছরের ইচ্ছে। কিন্তু কেউ আমার ইচ্ছে পূরণ করেনি। আমিও আশা করে আছি, তোমাদের কেউ না কেউ একদিন আমার ইচ্ছে পূরণ করবে।'

হঠাৎ দূর থেকে দেখি বাবা আসছেন। পুকুরে বাবার প্রতিচ্ছবি পড়েছে। আর বাবাকে আসতে দেখেই পুকুরটাও চুপ হয়ে যায়।

বাবা আমার কাছে এসে বললেন, 'কী করছ?'

আমি বললাম, 'দেখছি।'

বাবা বললেন, 'কী দেখছ?'

বললাম, 'পুকুরের টলটলে পানিতে মেঘের কী সুন্দর প্রতিচ্ছবি, দেখেছ বাবা? আকাশের নীল রংও দেখা যাচ্ছে পুকুরের পানিতে।'

বলেই আমি পুকুরের টলটলে পানির দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার সাথে সাথে বাবাও তাকান। তাকাতে তাকাতে হঠাৎ বাবা যেন কেমন হয়ে যান। আর কিছু বললেন না। যেমন হঠাৎ করে এসেছিলেন, তেমন হঠাৎ করেই চলে গেলেন।

স্কুলে যাওয়ার সময় আমি পুকুরের পার দিয়েই যাই। পুকুরের বিশাল পার। এত বড়ো যে ইচ্ছে করলে পুকুরটাকে দিঘি বানিয়ে ফেলা যায়। দিঘি মানেই তো বড়ো পুকুর।

পরদিন সকালেও আমি পুকুরের পার দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, পুকুরের পশ্চিম পারে অনেক মানুষ। এত মানুষ কেন? আমি দ্রুত এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি পুকুরের পশ্চিম পাশটা কাটা হচ্ছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করি, 'কী হচ্ছে আনিস চাচা?'

আনিস চাচা বললেন, 'পুকুর কেটে দিঘি বানানো হবে।'

বললাম, 'কে বলেছে?'

আনিস চাচা হেসে বললেন, 'কে আর বলবে? বলার মতো কে আর আছে? তোর বাবা বলেছে।'

আমি বেশ খুশি হয়ে যাই। তাহলে কি গতকাল বিকেলে পুকুর পারে এসে বাবার ছোটোবেলার কথা মনে পড়েছে? পুকুরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়েছে? ■

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

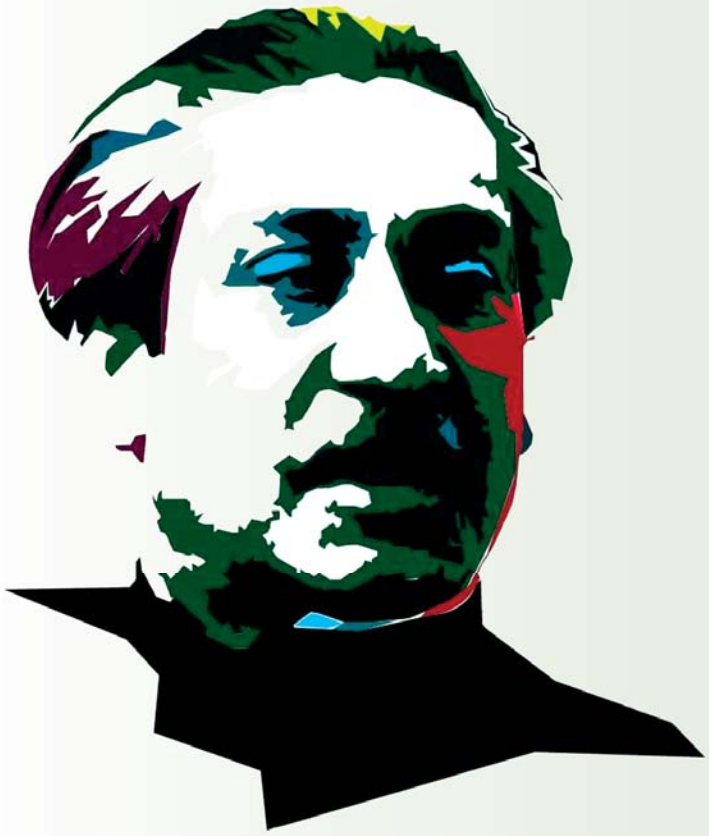

জাতির পিতা

আরিফুল ইসলাম মুকুল

সারা পৃথিবী জুড়ে
যার রয়েছে সুনাম
তিনি আমাদের জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে
আমরা পেলাম স্বাধীনতা
তিনিই আমাদের
অবিসংবাদিত মহান নেতা।

তোমার তুলনা তুমি

মঈনুল হক চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
তোমাকেই মনে পড়ে,
তুমি জাগ্রত আমাদের বুকে
বাংলার ঘরে ঘরে।

তোমার জন্য মুক্ত স্বদেশ
স্বাধীন জন্মভূমি,
তুমি আমাদের জাতির পিতা
তোমার তুলনা তুমি।

তোমার স্মরণে শিল্পীরা গান
গাইবে সুরে সুরে,
তুমি আছ এই বাঙালির বুকে
হারিয়ে যাবে না দূরে।

এ দেশের মাটি আকাশ সীমানা
তোমার হাতেই আঁকা,
তুমি বাঙালির গর্বের ধন
হৃদয়ে রয়েছ মাখা।

গল্প

করোনা ভূত

রফিকুর রশীদ

‘ভূতের সঙ্গে কথা হয় তোমার?’

আমার প্রশ্ন শুনে রুম্পা চোখ গোল গোল করে তাকায়। ক্ষণে ক্ষণে তার অভিমান হয়। অভিমানে গাল ফুলে ট্যাবা লেবুর মতো হয়। গাল ফুলিয়ে সে আবার উলটো প্রশ্ন করে,

‘তার মানে আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না?’

সহসা আমি নিজেকে সামলে নিই,

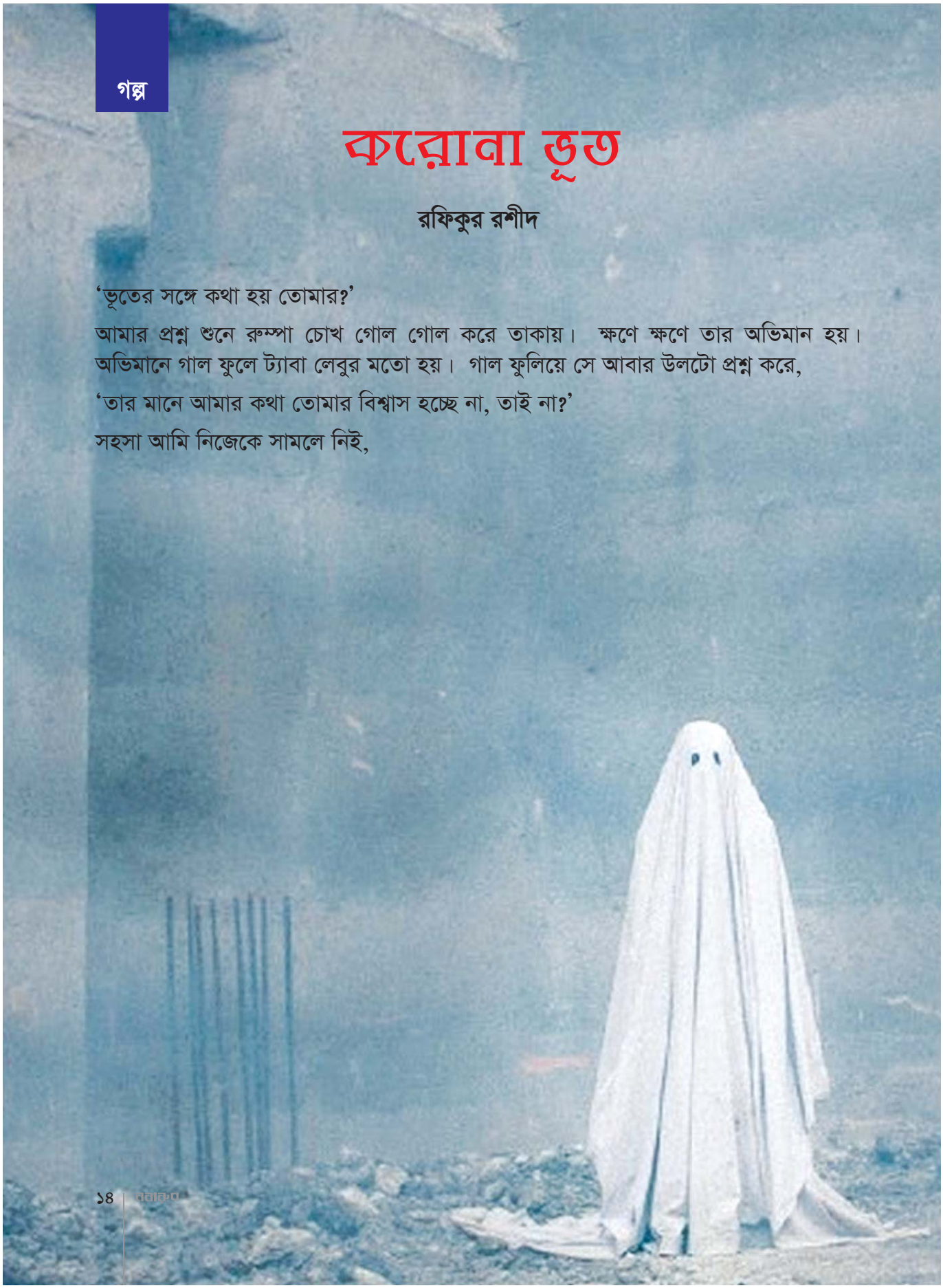

‘না না, আমি তাই বলেছি নাকি?’

‘ওই যে বললে মামা!’

‘কী বলেছি আমি?’

রুম্পা এবার রাগে আমার কোলের ভেতর থেকে পা বাড়িয়ে মেঝেতে নেমে পড়ে। বেশ ঝগড়াটে গলায় মনের ঝাঁজ ঝাড়ে,

‘সেই তখন থেকে আমি তোমাকে ভূতের গল্প বলছি, তুমি শুনছ না?’

‘কী মুশকিল! শুনছি বলেই তো প্রশ্ন করলাম। কথা হয় ভূতের সঙ্গে?’

‘হ্যাঁ, তার মানেই তো অবিশ্বাস!’

‘একে অবিশ্বাস বলে!’

‘ওহো, তুমি তো ভূতেই বিশ্বাস করো না, তোমাকে এ সব না বলাই ভালো।’

‘আচ্ছা রুম্পা, তোমাকে তো সত্যিই ভূতে ধরেছে দেখছি!’

‘কী করে বুঝলে মামা?’

আমি দু–হাতে গলা প্যাঁচিয়ে রুম্পাকে ধরে আবার কোলের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি। তার বাবরি চুলে হাত বুলিয়ে বলি,

‘ভূতে না ধরলে তো এমন আচরণ করার কথা নয় মামা!’

রুম্পা দু-হাত ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়,

‘মামা, এখন করোনার কাল, এত কাছে ঘেঁষা যাবে না তো!’

‘বাব্বা! তোমার ভূত-বন্ধুরা বলল বুঝি!’

রুম্পা আবার গাল ফোলায়। হাত নেড়ে নেড়ে বলে,

‘টেলিভিশনের মধ্যে তাহলে কতগুলো ভূত আছে বলো দেখি! সবাই তো দিনরাত বকবক করছে। এটা করো না, ওটা করো না।’

আমি রুম্পার কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ি। রুম্পা বড়ো মানুষের মতো করে বেশ টিপ্পনী কাটে,

‘ওরা কারা বলো দেখি!’

আমি চুপ করে আছি। রুম্পা জানায়,

‘ওরা সবাই ভূত।’

‘তাই নাকি!’

‘হ্যাঁ, কেউ মামদো ভূত, কেউ কেলো ভূত, কেউবা আবার সাদা চামড়ার শাঁকচুন্নি। সবাই বলছে - দূরে থাকো, দূরে যাও।’

‘ও তাই বলো।’

আমি এতক্ষণে ভাগনির মন জোগাতে চেষ্টা করি,

‘তাহলে তো অনেক ভূতের সঙ্গেই তোমার কথা হয় দেখছি।’

‘মামা, ভালো হবে না কিন্তু!’

‘কেন, ভালো হবে না কেন?’

‘তুমি তো আমার কথা মোটেই বিশ্বাস করোনি! পুরোটাই তামাশা মনে করেছ!’

আমার এখন মহাবিপদ! রুম্পা ছোটো মানুষ হলে কী হবে, কখন যে কোন কথা কোন দিক দিয়ে চালিয়ে দেবে তার ঠিকঠিকানা নেই। শ্যাওড়াতলায় এই নতুন বাসায় আসার পর থেকে রুম্পার মাথায় ভূত ঢুকেছে। ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এই বাসাটি রুম্পার বাবার কেন যে পছন্দ হয়েছিল সে কথা আমাদের জানা নেই। মাস দুয়েক আগে সহযোগিতা করার জন্য ইউনিভার্সিটির হল থেকে আমি এসে প্রথমেই বলেছিলাম–

দুলাভাই, এমন ভুতুড়ে বাড়ির খোঁজ পেলেন কেমন করে? ব্যাস, রুম্পা নাকি সেদিন থেকেই দু-দুটো ভূতের নাগাল পেয়ে যায়। আপা, মানে রুম্পার মা আমাকে ফোনে জানিয়েছে সেই ভূত দুটো খুবই ভালো। রুম্পার সঙ্গে কথা হয় তাদের। হাসিঠাট্টাও হয়। কখনো কোনো ক্ষতি করেনি। ওদের গল্প শুনে

শুনে আমি আবার একদিন এই বাসায় এসে আমার বোনকেই চেপে ধরেছিলাম, তুমিও কি রুম্পার মতো ছেলেমানুষ হয়ে গেলে আপা! বিজ্ঞানের এই যুগে কেউ ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে?

মুখে আমি বকাঝকা যতই করি, সব দোষের দায় আমার কাঁধেই থেকে যায়। ফেব্রুয়ারির বইমেলায় আমি ভাগনির জন্য ভূতের বই কিনে দিয়েছি, তাও একটা দুটো নয়, একসঙ্গে এক হালি; দোষ তো আমার হবেই। রুম্পা যে ভূতের বই ছাড়া অন্য বই নেবে না, বিভিন্ন স্টলের সাজানো বই থেকে ছবি দেখে দেখে সে নিজে পছন্দ করলে তখন আর কী করব আমি! দুলাভাই যে কিপটামি করে ভূতুড়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তাতে কোনো দোষ নেই। ভাগনির হাতে ভূতের বই কিনে দিয়ে যত অপরাধ হয়েছে আমার! রুম্পার যে দু-দুটো ভূতবন্ধু জুটেছে, তার জন্যেও নাকি আমিই দায়ী।

রুম্পাদের বাসায় আজ এসেছি ইচ্ছে করেই, রাত কাটাবার জন্যে। করোনা আতঙ্কে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তাঘাটও বন্ধ হলো বলে। আগামীকাল সকালে বাস ধরে আমি বাড়ি যেতে চাই। বাড়ি যাবার আগে রুম্পাদের সঙ্গে দেখা না করে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, লঙ্কাকাণ্ডও ঘটে যেতে পারে। কিন্তু এ বাসায় এসে আমি পড়েছি ভূতের পাল্লায়। চোখে দেখা যাক আর না-ই যাক, ভূতের অস্তিত্ব আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। রুম্পার সঙ্গে প্রতি রাতে ভূতের কথা হয়, ভূতেরা নাকি ক্লাসের পড়া মুখস্থ করিয়ে দেয়, এমন কি পরীক্ষার আগে ইমপর্টেন্ট প্রশ্নও বলে দেয়। এসব শুনে আমি হাসব না কাঁদব! আপাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। এসব আমাকেও বিশ্বাস করতে হবে?

আপার মন খারাপ। গত পরশু তার ভাসুর এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। বিমানবন্দর থেকে এই বাসায় আসার কথা, তারপর যাবে গ্রামের বাড়ি। কিন্তু তাকে বিমানবন্দরে আটকে দিয়েছে করোনার ভয়ে, দুলাভাই তাকে উদ্ধারের জন্যে বিস্তর ছোটাছুটি করছেন। আপা আমাকে বলেছেন রুম্পার কথা মেনে নিলেই তো পারতিস ভাই, এত তর্কের কী দরকার!

'তাই বলে না দেখে না জেনে একেবারে ভূতে বিশ্বাস?'

আপা কিছু বলার আগে রুম্পা বলে,

'সবকিছুই দেখতে চাও কেন বলো তো মামা!'

'না দেখেই মেনে নেব?'

'আচ্ছা। করোনা কি তুমি দেখেছ?'

'করোনা এক প্রকার ভাইরাস। আমি দেখিনি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা তার অস্তিত্ব ঠিকই টের পেয়েছে।'

'তারা ভাইরাস না ভূত দেখেছে কে জানে! সেই ভূতের ভয়ে এখন সবাই জড়োসড়ো।'

আমার মুখে আর কথা সরে না। এদিকে সেদিকে এলোমেলো ভাবে তাকাই। ভূতের প্রসঙ্গ থেকে সরে আসার জন্যে বলি, 'রুম্পার তো স্কুল ছুটি, নানুবাড়ি যাবে না?'

'গ্রামে কি ভূত-টুত নেই ভেবেছ মামা?'

'উহ, আবার সেই ভূত! সারা দুনিয়ার কাঁধেই তো দেখছি ভূত চেপেছে!'

রুম্পা এতক্ষণে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে,

'সাংঘাতিক ভূত কিন্তু মামা, গ্রামেগঞ্জেও হানা দিতে পারে, হুঁ। খুব সাবধান!'

আপাও আমার দিকে এগিয়ে আসে, 'হ্যাঁ, সাবধানে থাকিস ভাই। ওটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ভূত। বলা তো যায় না!'

রুম্পা সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে-

'করোনা ভূত।' ■

গল্প

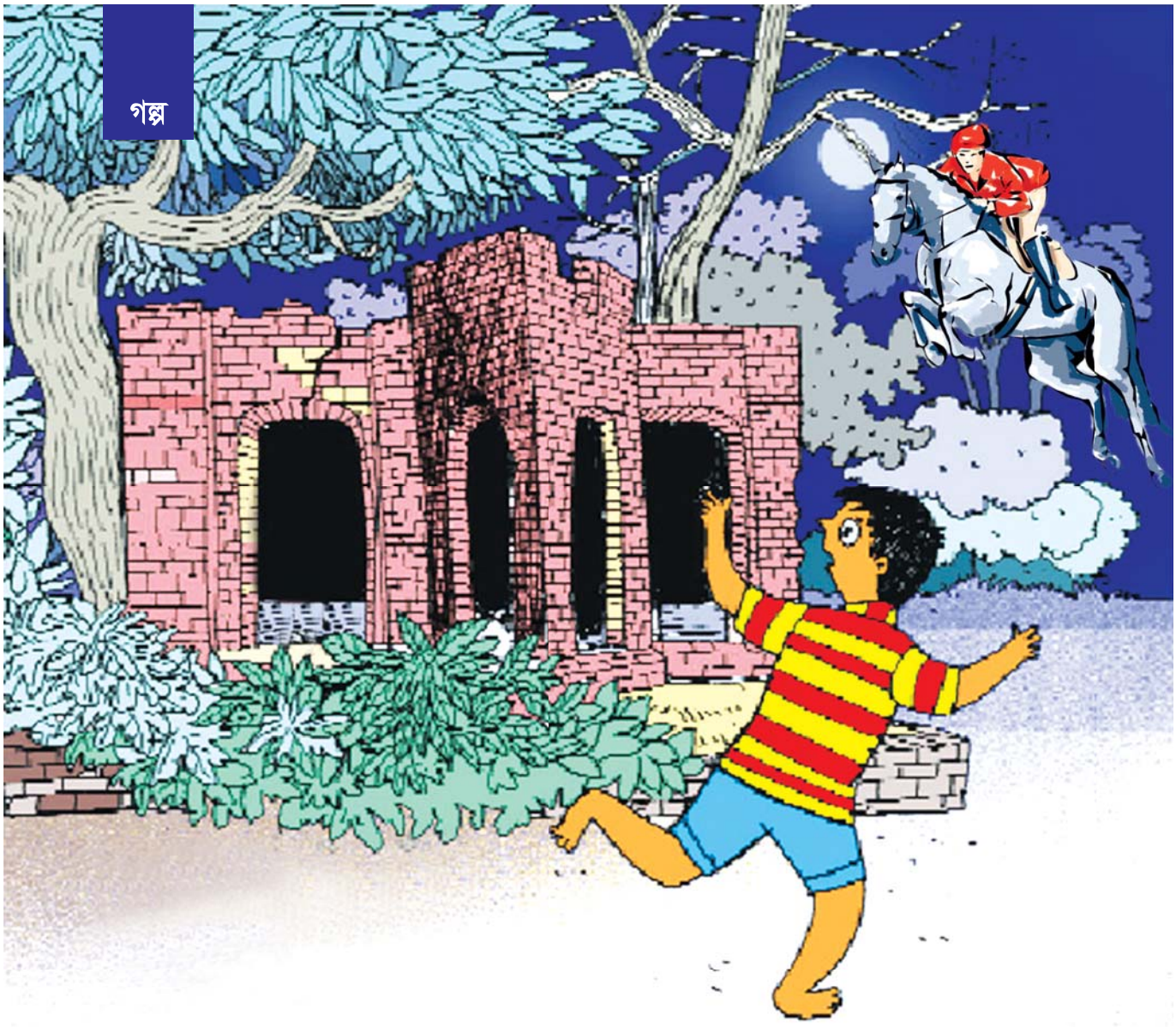

লোকটার মাথায় সোনালি চুল

দেলোয়ার হোসেন

আবু ক্লাসের পড়া শেষ করে ভাবল, স্কুলে যাবার সময় এখনো হয়নি। বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। একদিন অচেনা একটি লোক বলেছিল তোমার কোনো দুঃখ থাকলে আমাকে বলতে পারো। আমি তার সমাধান করে দেব। লোকটা সত্যি আজব প্রকৃতির। হঠাৎ সেই মানুষটির ছবিই ভেসে উঠল আবুর মনের মধ্যে।

এমন লোক আবু কোনোদিন দেখেনি। লোকটা বেঁটে। ছোটোদের মতো দাড়ি-গোঁফ নেই কিন্তু বয়সে সে মোটেও ছোটো নয়। শরীরের চামড়াও কুঁচকায়নি।

গায়ের রং গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো। আবু অবাক হয়ে বলেছিল, তোমার নাম কী? লোকটা তার নাম বলেনি। বলেছিল আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার দুটি জিভ লাগবে।

আবু ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সে ক্লাসের বই ছাড়াও নানান ধরনের বই পড়ে। কত কঠিন কঠিন শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারে। লোকটি বলেছিল, তোমার কি দুটো জিভ? তবে তোমাদের এই বাংলা উচ্চারণ করতে একটা জিভই যথেষ্ট। বাড়ির পেছনে তালগাছের সারি। তারপর একটি বটগাছ। সে বটের ঝুড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ দিকটা নির্জন বলে কেউ আসে না এদিকে। জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা বাড়ি– তারপর ফসলের মাঠ। কয়েকদিন আগে সে সাদা একটি খরগোশ দেখে এসেছিল এদিকে। আজও এসে দাঁড়াল সেই জঙ্গলের পাশে।

হঠাৎ আবুর দৃষ্টি চলে গেল বটগাছের দিকে। আবু তাকাতেই সেই লোকটা এগিয়ে এসে বোকাদের মতো হেসে বলল, হ্যালো। আবু ভাবল, এই মানুষটা কোথা থেকে এসেছে? মাথায় সামান্য কয়টা সোনালি চুল। আবু এটা-সেটা ভাবছে। শেষে লোকটাই বলল, তোমার মনে কি কোনো দুঃখ আছে?

এ আবার কেমন প্রশ্ন! আবু বলল, আমার কোনো দুঃখ নেই।

একবার ভালো করে ভেবে দেখ।

সেদিন খরগোশ দেখে এদিকে এসেছিলাম। খরগোশটা ধরতে পারলাম না। তাছাড়া গরিব লোকদের দেখলে দুঃখ হয়। সব মানুষ এক রকম হয় না কেন?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, এমন দুঃখ মোচনে আমার মুক্তি নেই।

তুমি কিসে বাঁধা পড়ে আছো?

লোকটা তাকিয়ে থাকল আবুর দিকে। হঠাৎ বলে উঠল–তোমার বয়স এখন এগারো। আবু বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। লোকটা বলল, তোমার নাম আবু। ভালো নাম আবু আরিফ।

হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছ।

আবু চিন্তা করল, লোকটা এসব কথা জানল কি করে? সে কি গণক না জাদুকর! আবু বলল, আমার দুঃখ মোচনেই কি তোমার মুক্তি? লোকটা বলল, ঠিক তাই।

তোমার এই মুক্তির কথাটা আমি বুঝলাম না।

তাহলে শোনো; এটা আমার দেশ নয়। এখানে আমাকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে।

কে দিয়েছে–কেনই বা দিয়েছে?

এত কথা জানতে চেয়ো না।

লোকটা এমন সব শব্দ উচ্চারণ করল যার অর্থ আবু কিছুই বুঝল না। সে ভাবল একি সেই সাত বামুনের এক বামুন! আবু তো রূপকথা পড়ার পোকা। তার মনটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আরো অনেক নাম না জানা দেশে চলে যায়। আর আবু হয়ে যায় রূপকথার শাহ্জাদা। পাগড়ি মাথায় হাতে তরবারি।

লোকটা গুডবাই বলে চলে গেল। আবু চেঁচিয়ে বলল, তুমি কোথায় থাকো বললে না? লোকটা এক লাফে তালগাছের মাথার উপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবু তো নির্বাক।

তারপর থেকে লোকটা আর এদিকে আসেনি। কিন্তু তাকে যে একবার আসা দরকার। কারণ আবুর মনে এখন সত্যি দুঃখ জমা হয়েছে। আর সে দুঃখের নায়ক আবুর স্কুলের অঙ্কের টিচার কান্তি বাবু। প্রথমদিন তাকে দেখেই আবুর মনটা খারাপ হয়ে যায়। তিনি ক্লাসে এসে ছেলেদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তার অগ্নিদৃষ্টিতে সবাই ভস্ম হয়ে যাবে। সজারুর কাঁটার মতো কাঁচা-পাকা গোঁফ। চেহারার মধ্যে মায়া-মমতার ছায়া নেই। হাঁড়ি ভাঙা গলার আওয়াজ। কথার মধ্যে রসকষের বালাই নেই।

কদিন পর টিফিন সময়ে কোথাও না গিয়ে ক্লাসে বসে 'পরীর দেশের রূপকথা' বইটি পড়ছিল। তখন বারান্দা

দিয়ে যাচ্ছিলেন কান্তি বাবু। আবুর হাতে বই দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ওটা কি বই রে আবু? আবুর বুকটা দুরুদুরু করলেও বুঝল স্যারের স্মরণশক্তি আছে। আবু ভালো মনেই বলল, 'পরীর দেশের রূপকথা'।

দেখি বইটা।

আবু বইটা স্যারের হাতে দিল। স্যার বই-এর পাতা উলটে-পালটে দেখে বলল, যত্ত সব বাজে বই। আজগুবি, ধাপ্পাবাজি। এসব পড়লে মাথায় অঙ্ক ঢুকবে কী করে? আবু বলল, আমি তো চাঁদের দেশের গল্পের বইও পড়ি। এসব পড়া কি অন্যায়? তিনি বললেন, তুমি পড়বে মনীষীদের জীবনী। তোমরা হলে এ যুগের ছেলে। পল্লির ফুল-পাখি নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। এই বলে তিনি বইটা ঠাস করে বেঞ্চের উপর ফেলে দিলেন। আবু চুপ। তবে মনে-মনে ভাবল স্যার এসব কী বলছেন! গল্পের বই পড়া কি অন্যায়? স্যার বললেন, তোমার বাবার নাম কি?

বাড়ির ঠিকানা?

শামীম চৌধুরী।

স্টেশন রোড, ই-৬৬

আবুর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে বাড়ি না গিয়ে মোল্লাদের আম বাগানে ঢুকল। মোল্লা হোমিও ডাক্তার– তার একটি ঘোড়া আছে। ঘোড়াটি বাড়ির সামনেই বাঁধা থাকে। আবু একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আমি তো অঙ্ক ভুল করি না, তবে কেন স্যার এত কথা শুনালেন।

হঠাৎ সে দেখল স্যার ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মোল্লা এসে বললেন, কি মাস্টার অভ্যাস আছে নাকি? স্যার বললেন, একটু আছে বৈকি। এক সময় অনেক দাবড়িয়েছি। কথা বলতে বলতে মাস্টার ঘোড়ায় উঠে বসলেন। বললেন, আপনি গুটি সাজান আমি আসছি। এই বলেই তিনি ছুটলেন।

আবু বুঝল স্যার এখানে এসে মোল্লার সাথে দাবা খেলেন। আর অপেক্ষা না করে আবু ফিরে গেল বাড়িতে।

স্যার চলে গেলে মা বাবাকে বললেন, এটা তুমি কি করলে? এই বয়সে এসব বই ও পড়বে না কেন? বাবা সরাসরি কিছু না বলে শুধু বললেন ওসব তুমি বুঝবে না– বলেই নিজের কাজে মন দিলেন। মা বললেন, তুই চিন্তা করিস না আমি তোকে বই কিনে দেবো।

ক্লাসের পড়া শেষ করে সে ভাবল 'নক্ষত্রের মেলা' বইটা একবার দেখি। এমন সময় নিচ থেকে বাবা ডাকলেন। আবু নিচে এসে দেখল অঙ্ক স্যার বসে আছে। বাবা বললেন, তোমার গল্পের বইগুলো নিয়ে এস। আবু বারোখানা বই গুছিয়ে নিয়ে এল। স্যার বইগুলো দেখলেন। তারপর বাবাকে বললেন, এই সমস্ত বই পড়ে মাথার মধ্যে কুসংস্কার ঢুকাচ্ছে এরা। আমি এসব বই পড়া পছন্দ করি না। বাবা কিছু না ভেবে এটাই বুঝে নিলেন যে, শিক্ষকের কথা মানতে হয়। বাবা বইগুলো আলমারিতে রেখে তালা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, আগে বড়ো হও তারপর যত খুশি এসব বই পড়বে– কেউ মানা করবে না। আবুর পৃথিবীটা যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। সে কিছুই বলতে পারল না। শুধু চোখ দুটো ভরে উঠল অশ্রুতে।

স্যার চলে গেলে মা বাবাকে বললেন, এটা তুমি কি করলে? এই বয়সে এসব বই ও পড়বে না কেন? বাবা সরাসরি কিছু না বলে শুধু বললেন, ওসব তুমি বুঝবে না– বলেই নিজের কাজে মন দিলেন। মা বললেন, তুই চিন্তা করিস না আমি তোকে বই কিনে দেবো।

এরপর থেকেই আবু বুঝতে পারল তার মনের মধ্যে দুঃখ জমতে শুরু করেছে। এবার ওর মনে পড়ল সেই লোকটির কথা। লোকটা বলেছিল তোমার দুঃখ আমি দূর করে দেব। তাতে আমিও মুক্তি পাব। তবে আবু বুঝল না লোকটি কিসের থেকে মুক্তি পাবে।

রবিবারে আবু দেখল বাবা ঘুমাচ্ছে, মাও এদিকে নেই। সে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেল বাগানের দিকে। ভরদুপুরে ঘুঘু ডাকছে বাঁশবাগানে। বটের শাখায়-শাখায় হরিয়াল পাখি বটের ফল খাচ্ছে মনের আনন্দে। দিগন্ত জোড়া সোনাইকুড়ির মাঠ। ধানের ক্ষেতে রং ধরেছে– ঝাঁক বেধে বাবুই পাখিরা বাতাসে দোল দিয়ে উড়ছে। চারদিকে যেন নতুন আলোর খেলা হঠাৎ কানে এল- হ্যালো!

আবু তাকিয়েই অবাক হলো। আরে এই লোকটা কখন এল! আমি তো মনে মনে তাকেই খুঁজছি। বেঁটে লোকটা বলল, তোমার কপালে দুঃখের রেখা ফুটে উঠেছে। কান দুটোও লাল দেখাচ্ছে। বলো তোমার কিসের দুঃখ। আবু তার অঙ্ক স্যারের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। বলতে বলতে চোখ দু'টো ভিজে উঠল আবুর।

লোকটা কয়েকবার আকাশের দিকে তাকাল। আবু ভয়ে ভয়ে বলল, তুমি কিছু করতে পারবে কি?

দেখি কী করা যায়। ঐদিন দেখলাম তোমার স্যার ঘোড়া ছুটাচ্ছে– যে মাঠের একদিকে ভাঙা বাড়িটা আছে।

তুমি কি সেখানেই থাকো?

ঐ ভাঙা বাড়িটার পেছনে আমার ট্রিডিঙ্গা পিপিটা রয়েছে।

আবু তার কথা ঠিক বুঝল না। লোকটা আবার আকাশের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আজ পূর্ণিমা। তুমি যদি বিশেষ কিছু দেখতে চাও তা'হলে চাঁদটা যখন তালগাছের মাথার উপর আসে তখন মাঠে এস। তবে লুকিয়ে থাকবে। ঘোড়া আর তোমার স্যারকে দেখতে পাবে। আবু একটু চিন্তা করে বলল, তুমি কি স্যারের ক্ষতি করতে চাও?

হো-হো শব্দে হেসে ফেলল লোকটা। বলল, ভয় পেও না আমরা কাউকে মারি না। একবার একটি লোককে ভয় দেখিয়েছিলাম সেই অপরাধে আমাকে সাজা দেয়া হয়েছে। আমাকে পাঠানো হয়েছে এই গ্রহে। আজ তোমার দুঃখ দূর করে আমার মুক্তির পথ সুগম করব। তারপর হয়ত তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না।

বাড়ি ফিরে আবুর শরীরটা কেমন কাঁপতে লাগল। আজব লোকটা যে কি করবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তবু সে যাবে।

সন্ধ্যার পরই আবুর বাবা-মা গেলেন একটা বিয়ের দাওয়াত খেতে। আবু ইচ্ছে করেই যায়নি। সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল। এক সময় চাঁদ উঠে এল তালগাছের মাথার উপর। দূরে কোথাও ডাকছে শিয়াল। কয়েকটা বাদুর উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে।

হঠাৎ আবুর কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। নির্জন মাঠ– কেউ কোথাও নেই। আবু গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ঘোড়াটা ছুটে আসছে এদিকেই। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে কান্তি বাবু। হঠাৎ ঘোড়াটা দু'পা উঁচু করে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। তিনি আবার উঠলেন ঘোড়ায়। এবার ঘোড়াটা উড়ে চলল উপর দিকে। এক সময় চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

আবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ কেউ বলল, তুমি বাড়ি যাও আবু। আবু চমকে উঠে দেখল সেই লোকটা। চাঁদের আলোয় তার মাথার চুলগুলো ঝিকমিক করছে।

অঙ্ক স্যার সাতদিন পর হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে আবুদের বাড়িতে এল। আবুর বাবার সাথে স্যারের কি কথা হলো আবু তা জানে না। স্যার চলে গেলে বাবা আবুকে ডেকে বললেন, তোমার বইগুলো নিয়ে যাও। কান্তি বাবু এসব বই পড়তে সম্মতি দিয়েছেন।

সেই লোকটাকে আবু আর খুঁজে পেল না। তখন তার মনে হলো, তবে কি সে অন্য গ্রহ থেকে এসেছিল? ■

আপনার সন্তানকে সময় দিন

মো. জামাল উদ্দিন

করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে অনেকেই ঘরে থাকছেন। আমরা সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ হিসেবে নিতে পারি সময়টাকে। এতে তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাববে।

প্রতিটি সন্তানের সঙ্গেই সময় কাটান

প্রতিটি সন্তানের সঙ্গে প্রতিদিন আলাদা করে ২০ মিনিট বা তার বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। এতে তারা নিজেদের আপনার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে।

শিশুসন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানোর কৌশল

- ❖ সুখের অভিব্যক্তি ও আওয়াজ নকল করুন
- ❖ গান গাইতে পারেন, কাপ-প্লেট-বাটি-চামচ দিয়ে বাজনা বাজাতে পারেন
- ❖ গল্প বলুন, বই পড়ে শোনান কিংবা ছবি দেখান।

কিশোর সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর কৌশল

- ❖ তাদের যে বিষয়গুলো পছন্দ, সেসব বিষয়ে কথা বলুন। এসব বিষয়ের মধ্যে থাকতে পারে খেলাধুলা, সংগীত ক্রীড়াঙ্গন বা অন্য কোনো অঙ্গনের তারকা কিংবা বন্ধু
- ❖ তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রিয় কোনো খাবার তৈরি করুন
- ❖ তাদের পছন্দের গানের সঙ্গে তাল মিশিয়ে ব্যায়াম করুন।

সন্তানকে জিজ্ঞেস করুন তারা কী করতে চায়

সন্তানদের কাজ বা যে-কোনো কিছু বেছে নেওয়ার সুযোগ নিন। এতে তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে উঠবে। তবে তারা যদি সামাজিক দূরত্বের নিয়ম কানুন উপেক্ষা করে কিছু করতে চায়, তাহলে সেটাই হবে এ বিষয়ে কথা বলার উপযুক্ত সুযোগ।

স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানোর কৌশল

- ❖ বই পড়ে শোনান কিংবা একসঙ্গে ছবি তুলুন
- ❖ ছবি আঁকুন
- ❖ গানের তালে তালে নাচুন কিংবা নিজেরাই গান গাইতে পারেন
- ❖ একসঙ্গে মজা করে ঘর পরিষ্কার কিংবা রান্না করতে পারেন
- ❖ বিদ্যালয়ের পড়ালেখা তৈরিতে সহযোগিতা করুন। ■

ভিয়েতনামের লোককাহিনি

চাঁদের দেশের মানুষ

মাহমুদুর রহমান খাঁন

অনেক বছর আগের কথা। ভিয়েতনামের একটি জঙ্গলের পাশে ছিল ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। সেই ঘরে কুই নামে এক গরিব কাঠুরে বাস করত। সে প্রতিদিন জঙ্গলে গিয়ে ছোটো ছোটো গাছ কাটত। গাছগুলোকে টুকরো টুকরো করে কাঠে পরিণত করত। তারপর সেগুলোকে জ্বালানি হিসেবে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। কুই টুকরো করা কাঠগুলোকে ছোটো ছোটো করে আঁটি বাঁধত। তারপর সেগুলোকে একটি লম্বা লাঠির দুপাশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে বাজারে বয়ে নিয়ে যেত। সে গরিব হওয়ায় তার কাছে কাঠগুলো টানার জন্য কোনো গরুর গাড়ি কেনার টাকা ছিল না। তাই কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কাঁধে করেই কাঠগুলোকে শহরের বাজারে বয়ে নিয়ে যেত।

একদিন সকালে কুই জঙ্গলে কাঠ কাটছিল। এমন সময় সে দেখতে পেল তিনটি বাঘ শাবক জঙ্গলের এক কোণে খেলা করছে। কুই সতর্কতার সাথে চারপাশে তাকাল এবং কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বুঝতে পারল বাচ্চাগুলোকে জঙ্গলে রেখে তাদের মা শিকারের জন্য বের হয়েছে। তখন তার মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি এল। সে ভাবল এখান থেকে একটি বাচ্চা ধরে নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারলে বেশ ভালো টাকা পাওয়া যাবে। তা দিয়ে সে একটি গরুর গাড়ি কিনতে পারবে। সে শিকারিদের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে সামনে এগোতে থাকল। একটু সামনে এগিয়ে বাচ্চাগুলোর খুব কাছের একটি গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকল। বাচ্চাগুলো তখনো একে অপরের সাথে খেলা করছিল। হঠাৎ খেলতে খেলতে একটি বাচ্চা তার হাতের কাছে আসতেই সতর্কতার সাথে কুই দু-হাত দিয়ে শক্ত করে বাচ্চাটির গলায়

চেপে ধরল। এমনভাবে চেপে ধরল যাতে বাচ্চাটি তাকে কামড় বা খামচি দিতে না পারে। এই ঘটনাটি দেখে অন্য শাবকগুলো ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ে লাফালাফি করতে লাগল।

কুই ভাবল মা বাঘ আসার আগে বাচ্চাটিকে নিয়ে খুব দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কয়েক পা বাড়ানোর পরেই পিছন থেকে খুব জোরে জঙ্গল কাঁপানো বাঘের গর্জন শোনা গেল। সে পিছে তাকিয়ে দেখে মা বাঘটি সেখানে উপস্থিত। মা বাঘটিকে দেখে ভয়ে যেন তার কলিজা কেঁপে উঠল। দিশেহারা কুই তাই শাবকটিকে হাতে নিয়েই দ্রুত কাছের একটি গাছ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কিছুটা উপরে উঠার পর তার হাত থেকে বাঘ শাবকটি কোনোরকমে চেষ্টা করে ছুটতে সমর্থ হয়। শাবকটি ততক্ষণে কুইয়ের হাত ফসকে মাটিতে পড়ে খুব জোরে আঘাত পেল।

কুই গাছের উপরে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করতে থাকল। কুই যে গাছটিতে বসে আছে তার খুব কাছেই ছিল একটি ঝরনা। ঝরনাটির পাশে ছিল ছোট্ট একটি বটগাছ। সে দেখতে পেল মা বাঘটি সেই বটগাছটি থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে মুখে নিল। তারপর পাতাগুলোকে চিবিয়ে সেগুলো তার আহত শাবকের মাথায় ছুঁইয়ে দিল। আহত শাবকটি সাথে সাথে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে গেল। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে সে আগের মতো তার ভাইদের সাথে খেলাধুলা করতে লাগল। বাচ্চাটিকে দেখে পুরোপুরি স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। যেন কিছুই হয়নি তার। এরপর শাবকগুলো মায়ের সাথে একটু আগে শিকার করে আনা হরিণের মাংস খেতে চলে গেল।

বাঘগুলো সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর কুই চুপিসারে গাছ থেকে নামল। কৌতূহলবশত সে বটগাছটির কাছে গেল। গাছটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর গাছ থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে সেগুলো নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ শুঁকল। তার কাছে পাতাগুলো অন্য সাধারণ বটগাছের পাতার মতোই মনে হলো। সে ভাবল শাবকটি এমনিতেই সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। তার সুস্থতার পিছনে এই পাতার কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। তবুও মনের কৌতূহল থেকেই সে কিছু পাতা ছিঁড়ে পকেটে ভরে নিয়ে নিল। যাতে করে পরবর্তীতে এগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। সেদিনের মতো কুই সবকিছু গুছিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা ধরল।

হেঁটে হেঁটে বাড়ির অনেকটা কাছে পৌঁছে গেল। একটু সামনে এগিয়ে সে দেখল একটা আহত কুকুর রাস্তায় পড়ে আছে। কাছে যাওয়ার পর সে কুকুরটাকে চিনতে পারল। এটা ছিল তার প্রতিবেশী এক কাঠুরের ছেলের পোষা কুকুর। ছেলেটা এই খবর শুনতে পেলে খুব কষ্ট পাবে ভাবতেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ তার কিছুক্ষণ আগে জঙ্গলে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। তারপর সে পকেটে রাখা পাতাগুলো থেকে কিছু পাতা বের করে মুখে নিয়ে চিবুতে লাগল। এরপর পাতাগুলোকে মুখ থেকে বের করে কুকুরটির মাথায় ধরল। তাকে অবাক করে দিয়ে কুকুরটি খুব দ্রুত নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল। কুকুরটি জিহ্বা দিয়ে কুইয়ের হাত চেটে চেটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেখান থেকে চলে গেল। এমন ঘটনা দেখে কুই অবাক হয়ে গেল। জাদুকরী একটি গাছের সন্ধান পেয়েছে ভেবে সে খুব পুলকিত বোধ করল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের ভিতরে ঢুকেই সে খোঁড়াখুঁড়ি করার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে নিল। এরপর দ্রুত জঙ্গলে সেই বটগাছটির কাছে গেল। সে খুব সাবধানে গাছটির গোড়ার চারপাশের মাটি খুঁড়ে গাছটিকে উপড়ে ফেলল। তারপর অনেক কষ্টে সেটিকে কাঁধে করে বাসায় নিয়ে এল। সে তার নিজের বাসায় গাছটিকে রোপণ করল। কুই নিয়মিত পানি দিয়ে গাছটির পরিচর্যা করতে লাগল। ধীরে ধীরে গাছটি বড়ো হয়ে বেড়ে উঠল।

এরপর আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে নতুন বছর। তাই কুই কিছু কাঠ,

গোলাপি রঙের এক ধরনের গাছের ডাল এবং কতগুলো হলুদ অ্যাপ্রিকট ফুল একত্রিত করল। সে এগুলো সাথে নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে শহরে রওয়ানা হলো। নববর্ষের উৎসব শহরে খুব জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। এসময় মানুষের মাঝে খুব উৎসবমুখর পরিবেশ থাকে। শহরের পথঘাট সুন্দরভাবে সাজানো হয়। কয়েক ঘণ্টা যাত্রার পর কুই শহরে পৌঁছায়। পৌঁছানোর পর সে লক্ষ করল সেখানকার রাস্তাঘাটে কোনো উৎসবমুখর পরিবেশ নেই। সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। শহরের মানুষের মনেও কোনো আনন্দ নেই। তারা সবাই মুখ ভার করে আছে। কুই চিন্তিত হয়ে মানুষের কাছে এর কারণ জানতে চাইল। এক বৃদ্ধ তাকে বলল তাদের রাজ্যের রাজকুমারীর জন্য সবার খুব মন খারাপ। তাদের রাজার একমাত্র কন্যা রাজকুমারী নুয়েত তিয়েন খুব অসুস্থ। তিয়েন দেখতে খুবই সুন্দরী এবং খুব ভালো মনের মানুষ। ফুল, লতাপাতা এবং প্রকৃতিকে সে ভীষণ ভালোবাসে। অসুস্থ হয়ে তিয়েন এখন বিছানায় শয্যাশায়ী। তাকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। রাজার সমস্ত টাকাপয়সা ও ধনসম্পত্তি দিয়েও তাকে আর সুস্থ করা সম্ভব নয়।

এমন বেদনাময় ঘটনা শুনে কুইয়ের খুব মন খারাপ হলো। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার পকেটে ঐ জাদুকরী গাছের কিছু পাতা রয়েছে। সে এর জাদুকরী ক্ষমতা জানার পর থেকে সবসময় কিছু পাতা সাথে রাখে। যাতে করে সে তার কোনো আহত বন্ধুর ক্ষত বা রাস্তায় আহত হওয়া পশুপাখি কিংবা কাঠ কাটতে গিয়ে পাওয়া আঘাত সারিয়ে তুলতে পারে। তার বিশ্বাস এই পাতার মাধ্যমে রাজকুমারী তিয়েনও সুস্থ হয়ে উঠবে। সে তৎক্ষণাৎ তার হাতে থাকা কাঠ ও ফুলগুলোকে সেখানে ফেলে রেখেই রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

প্রাসাদটি ছিল অনেক দূরে। সে হন্যে হয়ে পথে হেঁটে হেঁটে রাজপ্রাসাদটি খুঁজতে লাগল। কখনো একে জিজ্ঞেস করে। কখনো ওকে জিজ্ঞেস করে। এভাবে করে সেখানে পৌঁছুতে তার প্রায় সারাদিন লেগে যায়। পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন হেলে পড়েছে। তাই সে দেরি না করে প্রাসাদে উঠার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সারাদিনের কঠিন যাত্রা শেষে তার শরীর ও হাত-পা ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্রাসাদের প্রধান দরজায় পৌঁছানোর পর প্রহরীরা তার এই জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে তাকে ভিক্ষুক মনে করল। তারা তাকে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। তবুও সে বার বার প্রহরীদেরকে বোঝাতে লাগল তাকে যে ভিতরে যেতে হবেই। কেননা একমাত্র সেই পারে রাজকুমারীকে সুস্থ করে তুলতে। একথা শুনে প্রহরীরা রেগে গেল এবং একজন প্রহরী কুইকে জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। ক্লান্ত কুই ধাক্কা খেয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারল না। সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেল। তার পা কেটে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছিল। তারপর কুই তার পকেট থেকে সেই জাদুকরী বটগাছের কয়েকটি পাতা বের করল। সেগুলো চিবিয়ে সেখানে ধরল এবং সাথে সাথে তার আঘাত সেরে গেল। প্রহরীগণ স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। তারা কুইকে খুব দ্রুত অসুস্থ রাজকুমারীর কামরায় নিয়ে গেল।

কিন্তু রাজকুমারী এতটাই অসুস্থ ছিল যে সে খুব দ্রুত মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কুই সময় অপচয় না করে তার পকেটে থাকা অবশিষ্ট পাতাগুলো টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে রাজকুমারীর মাথায় ছুঁইয়ে দিল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজকুমারী ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল এবং মুহূর্তেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। রাজকুমারীর জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজা কুইয়ের সাথে তার মেয়ে নুয়েত তিয়েনের বিয়ে দিল। পাশাপাশি কুইকে কিছু জমি এবং প্রচুর সোনাদানা উপহার দিল।

এত এত সোনাদানা উপহার পেয়ে কুই এর মধ্যে থেকে কিছু বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিল। বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়ে কুই তার স্ত্রীর জন্য নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা

করল। সে বটগাছটির কোনো প্রকার ক্ষতি না করে কুঁড়েঘরটির সাথেই নতুন বাড়ি বানাবে বলে ঠিক করল। কিছুদিনের মধ্যেই সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি করা হলো। তারপর তার সুন্দরী স্ত্রী নুয়েত তিয়েনকে সেই বাড়িতে নিয়ে আসলো। তারা দুজনে মিলে সেখানে সুখে এবং শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

রাজকুমারী নুয়েত তিয়েন গাছপালা ও প্রকৃতি খুবই ভালোবাসে। তাই বাড়িটির চারপাশে তার পছন্দের ফুল গাছ লাগাতে চাইল। কুই রাজকুমারীকে অনুমতি দিল তবে শর্ত দিল যাতে বটগাছটির আশেপাশে কোনো গাছ না লাগায়। এক মাস যাবত রাজকুমারী বিভিন্ন প্রজাতির ফুল গাছ রোপণ করল। বিভিন্ন ফুলের সমারোহে পুরো বাড়ির উঠোন রঙিন হয়ে উঠল। একদিন তিয়েন জঙ্গলে হাঁটার সময় কিছু চমৎকার ডালিয়া ফুল গাছ দেখতে পায়। সে সেগুলো তার বাড়িতে লাগাবে বলে ঠিক করে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার বাড়ির পুরো উঠোন নানা ধরনের ফুল গাছে ছেয়ে গেছে। সেই বটগাছটির চারপাশের জায়গা ছাড়া নতুন গাছ লাগানোর জন্য কোথাও তিল পরিমাণ জায়গা নেই। তার স্বামী কুইকে পরে বুঝিয়ে রাজি করাতে পারবে ভেবে সে বটগাছটির কোনো প্রকার ক্ষতি না করে সেখানেই ডালিয়া গাছগুলো লাগানোর চিন্তা করল। তিয়েন বটগাছটির চারপাশে মাটি খনন করতে শুরু করল। কিছুদূর খনন করার পর দূর্ঘটনাবশত শাবলটি তার হাত থেকে ছিটকে গেল। শাবলটি সরাসরি বটগাছে আঘাত করে এবং গাছটির একটি শিকড় কেটে আলাদা হয়ে যায়। তাকে খুব অবাক করে দিয়ে বটগাছটি খুব জোরে গোঙানি দিয়ে কেঁদে উঠল। রাজকুমারী ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল এবং দ্রুত সেখান থেকে দূরে সরে গেল।

গাছটি ব্যথায় তার পুরো শরীর এদিক–ওদিক দোলাতে থাকল। তার শিকড়গুলো একটি একটি করে মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে লাগল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা। আকাশে ভেসে উঠেছে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান চাঁদ। গাছটি সন্ধ্যার আকাশে ভেসে থাকা সেই চাঁদ বরাবর উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কুই ঐ মুহূর্তে জঙ্গলে ছিল। তার স্ত্রীর ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে সে দৌড়ে বাড়ির দিকে আসতে লাগল। কিন্তু যতক্ষণে সে বাড়ি আসলো ততক্ষণে মহামূল্যবান বটগাছটি তার শেষ শিকড়টিও মাটি থেকে উপড়ে ফেলেছে। কুই তাড়াহুড়ো করে শিকড়টি টেনে ধরে গাছটিকে মাটিতে নামানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু বটগাছটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কুই তার সাথে শক্তিতে পেরে উঠছিল না। গাছটি দ্রুতগতিতে আকাশে উঠতে থাকল। কুইও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে শক্ত হাতে শিকড়টি আঁকড়ে ধরে রইল।

বটগাছটি প্রচণ্ড গতিতে উপরে উঠছিল। চারপাশে বাতাসের তীব্র চাপ অনুভূত হচ্ছিল। কুই নিচের দিকে তাকিয়ে তার কান্নারত স্ত্রীকে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে তার বাড়ির উঠোন ছোটো থেকে ছোটো হয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে পুরো গ্রামটি একটি ছোটো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল। গাছটি আকাশের তারাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ এভাবে চলার পর গাছটি চাঁদে পৌঁছে থামল। এরপর তার শিকড়গুলোকে চাঁদের ঝলমলে মাটিতে স্থাপন করল। বছরের পর বছর গেল। যুগের পর যুগ পার হয়ে গেল। কুই এখনো সেই বটগাছের নিচে বসে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে কবে এবং কীভাবে সে বাড়ি ফিরবে।

এরপর থেকে আজ অবধি যখনই কেউ চাঁদের দিকে তাকায় তখনই তারা সেখানে একটি বটগাছ দেখতে পায়। আর সেই বটগাছটির নিচে একজন মানুষকে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখা যায়। কুইয়ের বিশ্বাস কোনো একদিন সে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। এই আশাতেই সে এখনো চাঁদে বসে দুঃখের সাথে দিন পার করছে। ■

ম্যাজিক মশারি

ইমরুল ইউসুফ

মশাটাকে কিছুতেই মারা যাচ্ছে না। মারতে গেলেই মশাটার গতি যেন আরো বেড়ে যায়। মশারির এ কোনায় ও কোনায় গিয়ে লুকায়। ওড়ার সময় মশাটাকে মনে হয় একটি যুদ্ধ বিমান। আকাশে হাওয়ার বেগে উড়ছে। ভোঁ ভোঁ শব্দে উলটে পালটে মেঘের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আবার ফুড়ুৎ করে বের হচ্ছে। উড়তে উড়তে হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে।

রুপন্তি বলল, 'বাবা ঘুমাতে পারছি না। একটা মশা খুব ডিস্টার্ব করছে। একটু আগে মুখের কাছে ভন ভন করছিল। কিন্তু এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি আসো। মশাটি মেরে দিয়ে যাও।'

বাবা বইটা টেবিলের ওপর উলটে রেখে বললেন 'আসছি।'

বাবা হুড়মুড়িয়ে মশারির মধ্যে ঢুকলেন।

বললেন, 'মশার এত বড়ো সাহস। আমার মেয়েকে কামড়ায়? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!'

মজা কে কাকে দেখালো একটু পরেই বোঝা গেল।

কারণ রুপন্তির বাবা মশা না মারতে পেরে অস্থির হয়ে গেল। ঘেমে গেল। মশারির দড়ি ছিঁড়ল। কোনা ছেঁড়া মশারি তার মাথায় জড়াল।

বাবার এমন অবস্থা দেখে রুপন্তি হেসেই অস্থির।

বলল, 'বাবা তোমাকে কাকতাড়ুয়া কাকতাড়ুয়া লাগছে।'

'দুষ্টামি করো না। মাকে ডাকো।'

'মা শিগ্‌গির এসো। মশারি ছিঁড়ে গেছে। মশারি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। ছাড়িয়ে দিয়ে যাও।'

রুপন্তির চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে মা এলেন।

বললেন, 'বাবা মেয়ে কী শুরু করেছ? মশা মারতে গিয়ে দেখছি খাটটাই ভেঙে ফেলবে।'

বাবা বললেন, 'খাট ভাঙে ভাঙুক। মশার দাঁত-মুখ আজ ভেঙেই ছাড়ব। তুমি শুধু মশারির দড়িটা বেঁধে দাও। তারপর যা থাকে কপালে।'

মা রাগে গজগজ করতে করতে বললেন, 'কপালে কী আর থাকবে? মশারি মাথায় কপালে জড়িয়েছ তাই দেখতে পাচ্ছি।' এ কথা বলতে বলতে তিনি মশারির দড়ি বেঁধে দিলেন।

রুপন্তি বলল, 'বাবা, ওই যে মশা। তোমার মাথার উপরে ভন ভন করছে। মারো, মারো।'

বাবা অনেক কষ্টে মশাটি মারলেন।

বললেন, 'দেখলে তো পারি কি-না।'

'না বাবা পারোনি। ওই দেখো আরেকটি মশা। মশারির কোনায়। শিগ্‌গির মারো।'

'আরেকটি মশা কী করে এল? তুমি না বললে মশারির ভিতরে একটা মশা?'

'মনে হয় তোমার পিছন পিছন ঢুকেছে।'

'হতে পারে। মশারির ভিতর ঢোকার সময় ওরা আমাকে ফলো করছিল। সুযোগ পেয়েই পিছু নিয়েছে। এই সুযোগে রক্ত খেয়ে ঢোল হবে।'

রুপন্তির মা বললেন, 'ঢোলের শব্দ তাও সহ্য হয়। মশার ভনভনানি সহ্য হয় না। যেভাবে পারো মশা মেরে তারপর বের হও। একে তো গরম। সেইসাথে আছে মশার অত্যাচার। গরম আর মশার কামড়ে রাতের ঘুমটাই হারাম।'

'ঘুমটা যাতে আরামের হয় বাবা মেয়ে সে চেষ্টাই তো করছি।' বললেন রুপন্তির বাবা।

সকাল হলো। রুপন্তি জানালা দিয়ে দেখল, বাবা দাঁত ব্রাশ করতে করতে পুকুরপাড়ে হাঁটছেন। রুপন্তি খাট থেকে নেমে বারান্দায় গেল। ব্রাশে পেস্ট লাগাল। তারপর ব্রাশ করতে করতে পুকুর পাড়ে গেল। দেখল, দাদি কলতলায় হাত-মুখ ধুচ্ছেন। তার আশপাশে বড়ো বড়ো মশা ভন ভন করছে। একটি মশা রক্ত খেয়ে দাদির পায়ের পাশে পড়ে আছে।

রুপন্তি বলল, 'দাদি কী করছ? তোমাকে মশা কামড়াচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো না?'

'কতক্ষণ আর দেখব সোনা। এত মশা। যায় না বসা। দেই ঘষা। মরে না মশা। তারপর বলো, রাতে ঘুম হলো?'

'ভালো হয়েছে। তবে একটি মশা খুব ডিস্টার্ব করছিল। বাবা মেরে দিয়েছে। আচ্ছা দাদি, তুমি এ ছড়া কোথা থেকে শিখলে?'

'কোন ছড়া?'

'এই যে এখন বললে। মশা নিয়ে ছড়া। এ ছড়া তো আমার বাবা বলে।'

'তোমার বাবার কাছ থেকেই শিখেছি।'

'এখানে এত মশা কেন দাদি?'

'ঝোপঝাড়, ডোবা, নালা বেশি তো তাই। তা ছাড়া এখানে শহরের মতো ওষুধ ছিটায় না।'

'হুম। জানি দাদি। তুমি কী জানো কীভাবে মশার জন্ম হয়। ছেলে মশা কামড়ায় নাকি মেয়ে মশা কামড়ায়। মশারা কতদিন বাঁচে?'

‘আমি জানি না।’

‘আমি জানি দাদি।’

‘তুমি এতকিছু জানো কী করে?’

‘টিভিতে সবসময় দেখায়। তা ছাড়া আমি এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। আমাদের বইয়ে অনেক কিছু আছে। আচ্ছা বলো তো আমার জন্মদিন কবে?’

‘জানি, এবার ঈদের পরের দিনই তোমার জন্মদিন পড়েছে।’

এমন সময় রুপন্তির বাবা কলতলায় এলেন।

বললেন, ‘চলো। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে যাই।’

এই কথা বলে বাবা-মেয়ে পুকুরে নামে। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে যায়।

ঘরে ঢুকতেই মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠে। রুপন্তি দৌড়ে ফোনটি ধরে। ছোটো চাচ্চু ফোন করেছেন।

‘চাচ্চু কেমন আছ? তুমি আসছ না কেন? জানো না আর দু-দিন পরেই আমার জন্মদিন! তুমি তাড়াতাড়ি এসো।’

‘অফিস ছুটি হলেই আসব। জন্মদিনে তুমি কী নেবে বলো।’

‘তুমি যা দেবে তাই নেব।’

‘দাদা বাড়িতে কেমন লাগছে?’

‘ভালো লাগছে। তবে এখানে অনেক মশা। আমার গায়ে অনেক মশা কামড়েছে। ফুলে উঠেছে।’

‘আহারে! দুষ্টু মশাদের তাহলে তো উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ভাবছি– কী করা যায়। কী করা যায়। হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।’

‘কী পেয়েছ চাচ্চু?’

ইশফাক কাদের, ৯ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

‘ম্যাজিক মশারি। আর অডোমস। আমি আসার সময় তোমার জন্য ম্যাজিক মশারি আর অডোমস নিয়ে আসব। তাহলে মশা তোমাকে কামড়াতে পারবে না। সাথে অন্য গিফটও থাকবে।’

‘ম্যাজিক মশারি! সেটা কেমন মশারি চাচ্চু?’

‘উহু, আগেই বলা যাবে না। এটি বাজারে নতুন এসেছে। আগে নিয়ে আসি তারপর দেখবে। মোবাইলটা তোমার দাদিকে দাও।’

রুপন্তি দৌড়ে দাদির কাছে ফোনটা দিয়ে বাবার কাছে যায়।

বলে, ‘বাবা ম্যাজিক মশারি কী? ওই মশারি কি জাদু জানে? জাদু দিয়ে মশা ভ্যানিস করে দেয়?’

‘জানি না তো। কে বলেছে?’

‘চাচ্চু বলেছেন।’

আচ্ছা বাবা ‘অডোমস কী?’

‘অডোমস একটি ওষুধ। ওটি গায়ে মাখলে মশা কামড়ায় না। হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন?’

‘চাচ্চু বলেছেন ঢাকা থেকে আসার সময় আমার জন্য ম্যাজিক মশারি, অডোমস নিয়ে আসবে তাই।’

এই কথা বলে রুপন্তি বেডরুমে যায়। খাটের দিকে তাকিয়ে ম্যাজিক মশারির কথা ভাবতে থাকে। মনে মনে কল্পনা করে সেই মশারির কথা!

মশারিটা হবে খুব নরম। একেবারে তুলতুলে। পাতলা ফিনফিনে। সাদা ধবধবে। ছোট্ট একটা বাক্সের মধ্যে মশারিটা থাকবে। রিমোট চাপলেই বাক্স থেকে বেরিয়ে আসবে। আরেকবার রিমোট চাপলে মশারি টাঙানো হয়ে যাবে। ঝটপট তোশকের নিচে গোঁজা হয়ে যাবে। মশারিতে থাকবে সুন্দর একটি দরজা। সামনে দাঁড়ালেই দরজা খুলে যাবে। ভিতরে ঢোকার পর দরজা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। মশারির মধ্যে ফিরফির করে সুগন্ধি বাতাস ঢুকবে। ওই গন্ধে মশারা ছুটতে ছুটতে মশারির কাছে আসবে। মশারির গায়ে ঘেঁষতেই মশাগুলো ঠাস ঠাস করে মারা যাবে। ভয়ে তারা আর মশারির আশপাশে আসবে না। ঘুমের ডিস্টার্ব করবে না। চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে আসবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠলে মশারির দরজা খুলে যাবে। রিমোট চাপলে মশারিটার চার কোনা খুলে যাবে। নিজে নিজেই ফটাফট ভাঁজ হয়ে যাবে। তারপর ঢুকে যাবে বাক্সের মধ্যে। মশারি খোলা বা টাঙানো নিয়ে কোনো ঝামেলা থাকবে না। মশাও তার ইচ্ছেমতো রক্ত খেতে পারবে না।

‘রুপন্তি কোথায় তুমি? চলে এসো। দাদি নাশতা খেতে ডাকছেন।’

হঠাৎ মায়ের ডাক শুনে থতোমতো খেয়ে গেল রুপন্তি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘মা আসছি।’

কাল ঈদ। ছোটো চাচা ঢাকা থেকে এসেছেন। চাচাকে পেয়ে রুপন্তির আনন্দ যেন আর ধরে না। একে তো ঈদ। তার উপর জন্মদিন। নতুন নতুন জামা-জুতা। ক্লিপ, ফিতা। আরো কত কী! কিন্তু এ সবকিছু পেছনে ফেলেছে ম্যাজিক মশারি দেখার চিন্তা। সে চাচ্চুর পিছন পিছন ঘুরছে। মশারিটি দেখাতে বলছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে চাচ্চু তার জন্য ম্যাজিক মশারি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু চাচ্চু দেখাচ্ছে না। বলেছেন, ‘যেদিন জন্মদিন সেদিন দেখাব।’

জন্মদিনের কেক কাটা হলো। খাওয়াদাওয়া হলো। চাচ্চু অন্যান্য গিফটের সাথে ম্যাজিক মশারিটাও দিলেন। রুপন্তি গিফটের প্যাকেটটি নিয়ে দৌড়ে বেডরুমে গেল। মশারির বাক্সটি বের করে খাটের ওপর রাখল। দেখল তার কল্পনার চেয়ে বাক্সটি একটু বড়ো। ভাবল– সত্যিই কি এটি তার ভাবনার সেই ম্যাজিক মশারি? ভাবতে ভাবতে সে বাক্স থেকে মশারিটি বের করল। হাতে নিতেই মশারিটা এক লাফ দিলো। ধবধবে সাদা মশারিটা মুহূর্তেই খাটে টাঙানো হয়ে গেল। রুপন্তি অবাক চোখে দেখল মশারিতে সত্যিই সত্যি একটি দরজা আছে। মশারি থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। ■

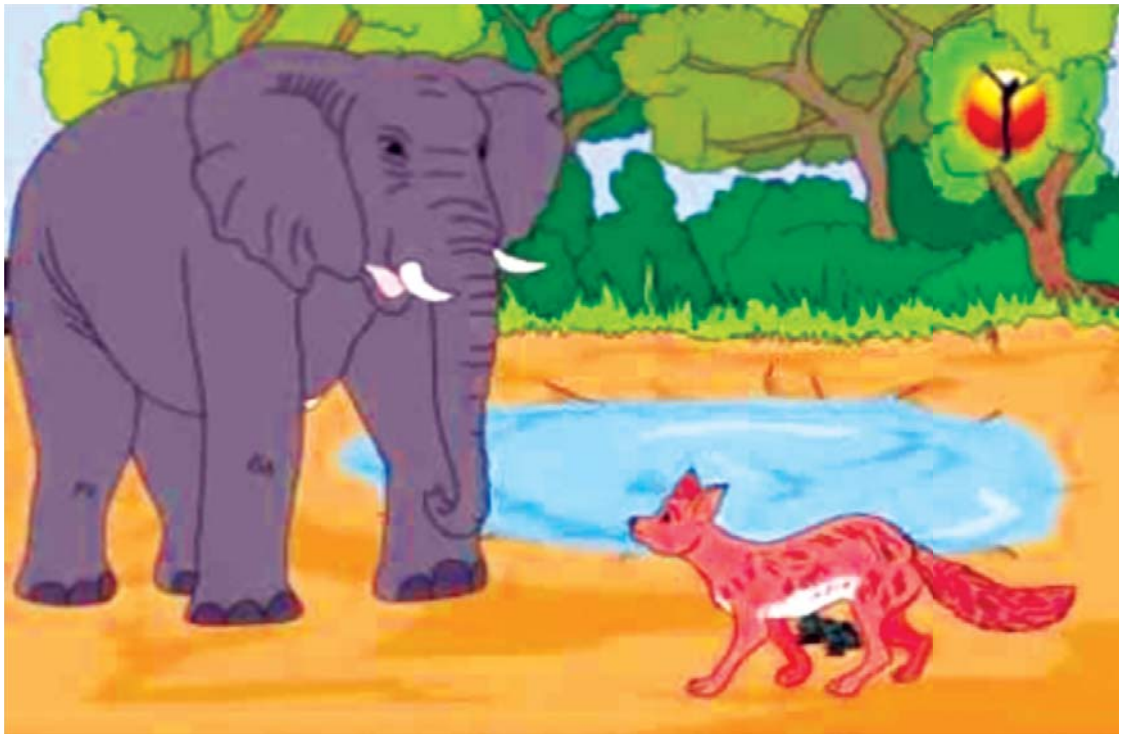

রাজ হাতি ও শেয়াল পণ্ডিত

মুহাম্মদ বরকত আলী

এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই রাজার মস্ত বড়ো এক হাতি ছিল। রাজা যেখানেই যেত সেই হাতির পিঠে চড়ে যেত। রাজার রাজ্যে হাতিশালে হাতি, ঘোড়া শালে ঘোড়া, নেহাত কম ছিল না। তবুও রাজা এই হাতিকে খুব পছন্দ করতেন। রাজার সেই হাতিটিকে সবাই রাজ হাতি নামেই চিনতো। এভাবে বেশ সুখেই ছিল রাজা, রাজ্য আর রাজ্যের প্রজারা। কিন্তু একদিন রাজ্যে দুঃখের ছায়া নেমে এল। হঠাৎ করেই রাজার হাতিটি মারা গেল। সারা রাজ্যে শোকের মাতম। প্রিয় হাতিটি মারা যাওয়ায় রাজা খুব কষ্ট পেলেন। রাজা কাঁদে, রানি কাঁদে, সেই কান্না দেখে সারা রাজ্যের প্রজারাও কাঁদে। কেঁদে আর কী হবে, রাজা তো আর তার প্রিয় হাতিটি ফেরত পাবে না। মরা হাতি দিয়ে আর কী হবে? তাই রাজার প্রহরীরা মৃত হাতিটি একটা ভাগাড়ে ফেলে প্রাসাদে ফিরে গেল। একটা শেয়াল যাচ্ছিল সেই ভাগাড়ের পাশ ঘেঁষে। মরা হাতিটির বিশাল দেহ দেখে সে কি আনন্দ। খিদেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছিল। এই সময় এমন আস্ত একটা হাতি খাবার হিসেবে পাবে সে ভাবতেই পারেনি। খুশিতে লাফাতে লাফাতে হাতির পেট ফুটো করে ঢুকে পড়ল ইয়া বড়ো পেটের ভিতর। বেশ জমিয়ে খেতে খেতে আরাম আয়েশ করে পেটের ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলবেলা বের হতে যাবে তখনি পড়ল এক মহাবিপদে। যেখানটা ফুটো করে পেটের ভিতর ঢুকেছিল সেখানে সারাদিন রোদের তাপে শুকিয়ে শক্ত হয়ে ফুটোটা ছোটো হয়ে গেছে। সেই ফুটো দিয়ে বের হওয়া শেয়ালের সাধ্য নেই। তাহলে এখন উপায়? হায় হায়, কী হবে এখন? ভাবতে ভাবতে ঠিকই একটা উপায় বের করে ফেলল। লোকের মুখে শুনেছ না, শেয়াল পণ্ডিত। ঠিক শুনেছ। শেয়াল অন্যান্য পশুর থেকে খুব বুদ্ধিমান। তাই তাকে

পণ্ডিত বলা হয়। এবার শোনো তার পাণ্ডিত্যের কথা। বিকেল বেলা এক প্রহরী রাজপ্রাসাদের কাজ শেষ করে সেই ভাগাড়ের পাশ দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। শেয়াল এই সুযোগটার জন্যই অপেক্ষা করছিল আর সেই ফুটো দিয়ে দেখছিল কেউ যাচ্ছে কিনা। রাজার প্রহরীকে দেখে শেয়াল বলল, এই প্রহরী, দাঁড়া। প্রহরী ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। হ্যাঁ তো, কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না তো। কে কথা বলল? ভূত না তো? কী জানি। এটা তো আবার ভাগাড়। ভাগাড়ে ভূত থাকতেই পারে। কিছুক্ষণ পর আবারও আওয়াজ ভেসে এল, এই প্রহরী আমাকে খুঁজে পাবি না। যা বলছি মন দিয়ে শোন, আমি রাজ হাতি বলছি। আমি এখনো মরিনি। রাজাকে খবর দে। আমাকে বাঁচাতে হলে আমার পেটের ফুটো জায়গাটার ঘি দিয়ে ডলে ডলে চামড়া নরম করতে হবে। তবেই আমি আবার উঠে দাঁড়াতে পারব। যা খুব তাড়াতাড়ি খবর দিয়ে আয়। একথা শুনে প্রহরী মরে কী বাঁচে দে ভোঁ-দৌড়। এক দৌড়ে রাজপ্রাসাদে। রাজাকে কথ াগুলো শোনাতেই রাজার মুখে হাসি ফুটল। আদেশ দিলো, যত ঘি লাগে নিয়ে চলো। রাজা, রাজ প্রহরী, সেনাপতি সকলেই ছুটল ঘিয়ের ভাঁড় নিয়ে। আনো ঘি, ঢালো ঘি; আনো ঘি, ঢালো ঘি, এভাবে ঘি দিয়ে হাতির পেটের ফুটো জায়গাটা ঘষতে লাগল। কয়েক মন ঘি দিয়ে ঘষতে ঘষতে ফুটো জায়গাটা নরম হয়ে বেশ বড়ো হয়ে গেল। এবার ভিতর থেকে শেয়াল পণ্ডিত বলল, এবার তোরা সরে দাঁড়া, আমি উঠে দাঁড়াবো। এখন আমি বেশ দুর্বল। উঠতে গিয়ে পড়ে গেলে তোরা আমার তলে পড়ে মরে যাবি। সবাই একশ হাত দূরে দাঁড়া। রাজার হুকুমে সবাই একশ হাত সরে দাঁড়ালো। এই মোক্ষম সময়। এই সুযোগে শিয়াল পণ্ডিত দেখে নিলো কোনদিকে ফাঁকা আছে। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে টুপ করে বের হয়ে সে কী দৌড়। রাজার প্রহরীরা শেয়ালের পিছু পিছু দৌড় দিল। শেয়াল দৌড়ায়, প্রহরী দৌড়ায়। শেয়াল দৌড়ায়, প্রহরী দৌড়ায়। শেয়ালের সাথে দৌড়ে প্রহরী পারে? কিছুতেই পারবে না। সবার বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা শেয়াল পণ্ডিতের চালাকি। ■

প্রিয় বাবা

সখিনা খাতুন

বাবা আমার আলো
দূর করেছে সকল কালো
বাবা আমার মাথার ছাতা
বিপদে-আপদে রক্ষা করেছে মাথা

বাবা আমার গুরু
তার হাত ধরেই শিক্ষাজীবন শুরু
বাবা আজ দূর আকাশের তারা
এত ডাকি তবু দেয় না সারা।

৫ম শ্রেণি, রেলওয়ে সরকারি স্কুল, আখাউড়া

অনুস্বার–বিসর্গ–চন্দ্রবিন্দু

তারিক মনজুর

পিলটু ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে অবাক হলো। বইয়ে লেখা রয়েছে, অনুস্বার, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দু হলো পরাশ্রয়ী বর্ণ। এর আগে বিজ্ঞান বইয়ে সে পড়েছে, কিছু উদ্ভিদকে বলে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। কিন্তু বর্ণ আবার পরাশ্রয়ী হয় কীভাবে? নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। যখন আরো বেশি প্যাঁচ খেয়ে গেল, তখন ফোন করল ভাষা-দাদুকে।

'দাদু, বর্ণ আবার পরাশ্রয়ী হয় নাকি?'

‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!’ ভাষা-দাদু দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমাচ্ছিলেন। পিলটুর ফোনে তার ঘুম ভেঙে যায়।

‘ব্যাকরণ বইয়ে দেখলাম, অনুস্বার, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দু পরাশ্রয়ী বর্ণ। এতদিন জানতাম পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ আছে। পরাশ্রয়ী বর্ণও আছে, তা তো জানতাম না।’

‘আমাদের বিজ্ঞানী পিলটু, তোমাকে বলছি। তার আগে আমাকে বলতে হবে, পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ কাকে বলে’

বিজ্ঞানের বিষয় এমনিতেই ভালো লাগে পিলটুর। সে খুব উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল, ‘যেসব উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে বাঁচে, তাদেরকে বলে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। যেমন, স্বর্ণলতা মাটিতে জন্মায় না। সে আম গাছ বা অন্য উদ্ভিদের উপর জন্মায়। তাই স্বর্ণলতাকে আমরা পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বলতে পারি।’

ফোনে পিলটু ব্যাখ্যা করছিল। আর ভাষা-দাদু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। পিলটুর বলা শেষ হলে দাদু এবার মুখ খুললেন। বললেন, ‘স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। যেমন, আ-এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বলো া-কার। ই-এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ি-কার। উ-এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ু-কার। এরকম দশটি কারচিহ্ন আছে বাংলা ভাষায়।’

‘তা তো আমি জানি!’

‘এই সংক্ষিপ্ত রূপগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে সুন্দর করে বসতে পারে। হাতে কাগজ-কলম থাকলে বোঝাতে সুবিধা হতো।’ এরপর ভাষা-দাদু নিজেই বুদ্ধি পেয়ে গেলেন। বললেন, ‘এক কাজ করো, পিলটু। খাতা-কলম নিয়ে আসো। আমি ফোনে যেভাবে বলি, লিখতে থাকো।’

পিলটু ফোন না কেটে খাতা-কলম নিয়ে বসল। বলল, ‘দাদু, এবার বলো।’

ভাষা-দাদু বললেন, ‘কাগজে লেখো ক।’

পিলটু লিখল ক। আর মনে মনে হাসতে লাগল। ক লেখা কোনো ব্যাপার নাকি!

দাদু বললেন, ‘এবার ক-এর সাথে দশটা কারচিহ্ন যোগ করো।’

পিলটু কথাটা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। ভাষা-দাদু তাই সহজ করে আবার বললেন, ‘ক-এর সাথে া-কার দিয়ে লেখো কা। তারপর ক-এর সাথে ি-কার দিয়ে লেখো কি। এভাবে ক-এর সাথে...’

‘দাদু, বুঝেছি।’ তারপর খাতায় ক-এর পাশে লিখল, ‘কা, কি, কী, কু, কূ, কৃ, কে, কৈ, কো, কৌ। ...কিন্তু, দাদু, এগুলো কেন লিখাচ্ছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘এই কার চিহ্নগুলো সব ব্যঞ্জনের সাথে সুন্দর মতো বসতে পারে। খ-এর সাথে বসতে পারে। গ-এর সাথে বসতে পারে।...’

‘দাদু, ঙ-র সাথে বসতে পারে?’

‘হ্যাঁ, ঙ-র সাথেও বসতে পারে। যখন আমরা বাঙালি লিখি, তখন ঙ-র সাথে বসে া-কার। যখন আমরা রঙিন লিখি, তখন ঙ-র সাথে বসে ি-কার।’

পিলটু কাগজে লিখল বাঙালি, রঙিন। তাই তো! ঙ-র সাথেও তো া-কার, ই-কার বসতে পারে।

‘তাহলে, দাদু, সব ব্যঞ্জনবর্ণের সাথেই া-কার-ই-কার বসতে পারে। তাই তো?’

‘না, সব ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে া-কার, ই-কার বসতে পারে না।’ দাদু হাসেন, ‘এতক্ষণে আমরা আসল জায়গায় এসেছি। অনুস্বার, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দুর সাথে া-কার ই-কার বসাও দেখি!’

পিলটু খাতায় ং, ঃ আর ঁ লিখল। তারপর অবাক হয়ে দেখল, এগুলোর সাথে া-কার ই-কার যোগ করা যাচ্ছে না। সে বলল, ‘বুঝলাম। কিন্তু, দাদু, এই কথা দিয়ে তুমি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চাচ্ছ?’

‘সিদ্ধান্ত!’ পিলটুর কথাবার্তার মধ্যে বিজ্ঞান-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দাদু হাসলেন। বললেন, ‘যে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ কারচিহ্নকে আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দু কারচিহ্নকে আশ্রয় দিতে পারে না। আশ্রয় দেবে কী, ওরা নিজেরাই থাকে অন্য বর্ণের আশ্রয়ে!’

ভাষা-দাদুর কাছে বুঝে নেয়ার পর পিলটু ফোন রেখে দিল। তারপর নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করল।

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ হলো যারা অন্যের আশ্রয়ে থাকে। পরাশ্রয়ী বর্ণও তাই। অন্য বর্ণের আশ্রয়ে থাকে। এরপর দাদুর ব্যাখ্যা আরেকবার ভাবল। ক খ গ ঘ ঙ – বর্ণমালার সব ব্যঞ্জনের সাথে া-কার, ি-কার, ু-কার ইত্যাদি কারচিহ্ন যোগ করা যায়। কিন্তু ৎ, ঃ, ঁ – এই তিন বর্ণের সাথে া-কার, ি-কার, ু-কার যোগ করা যায় না।

পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে পিলটু আবার বই খুলতে গেল। তখনই দেখা দিল নতুন সমস্যা! তাই আবার ফোন করতে হলো ভাষা-দাদুকে। 'দাদু, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

ভাষা-দাদু একটু অবাকই হলেন, 'আবার কী সমস্যা?'

দাদু 'তুমি তো বললে যেসব বর্ণের সাথে কারচিহ্ন যোগ করা যায় না, সেগুলো হলো পরাশ্রয়ী বর্ণ। কিন্তু ৎ-এর সঙ্গেও তো া-কার ই-কার যোগ করা যায় না। তাহলে খণ্ড-ত কি পরাশ্রয়ী বর্ণ? পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা তাহলে কয়টা? তিনটা নাকি চারটা?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও', ভাষা-দাদু এবার নিজেই বুঝে নেয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, ৎ-এর সাথে া-কার ই-কার যোগ করা যায় না। তাই একেও আসলে পরাশ্রয়ী বর্ণের তালিকায় ফেলা যেত। কিন্তু বাংলা প্রচলিত ব্যাকরণ ৎ-কে পরাশ্রয়ী বর্ণের তালিকায় রাখেনি। তুমি কোনোদিন ব্যাকরণ লিখলে, খণ্ড-ত প্রসঙ্গে এই কথাগুলো লিখে রেখো।'

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কয়টি, পরীক্ষায় এলে কী লিখব?'

'সমাস কয় প্রকার, উপসর্গ কতটি, কণ্ঠবর্ণ কয়টি – এ ধরনের প্রশ্ন আমি পরীক্ষায় দেওয়ার পক্ষপাতী নই। সংখ্যা কতটি, এ ধরনের প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝল, তা যাচাই করা যায় না।'

'তাহলে পরীক্ষায় কী প্রশ্ন থাকবে?'

'পরীক্ষায় থাকতে পারে, নীলপদ্ম এটা কর্মধারয় সমাস কেন? পরাজয় শব্দে উপসর্গ কোনোটি? ক খ গ ঘ ঙ – এগুলোকে কণ্ঠবর্ণ বলে কেন?...'

'আর ৎ ঃ ঁ কেন পরাশ্রয়ী বর্ণ? তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।' ভাষা-দাদু হাসেন। ■

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

মাহমুদা কামাল

জুন মাসের ১২ তারিখ, বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০০২ সাল থেকে জুন মাসের ১২ তারিখে দিবসটি পালন করা শুরু করে। প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে দিবসটি পালিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- 'COVID-19: Protect children from Child labour, now more than ever'।

সমগ্র বিশ্বে শিশুশ্রম বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে সম্ভাব্য করণীয় স্থির করাই হচ্ছে এই দিবসটির মূল উদ্দেশ্য।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি কাজকে সরকার শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বলে ঘোষণা করেছে। এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে প্রায় ১ লাখ শিশু যারা সবাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের প্রত্যাহার করে ১৮ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ছয় মাস মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রায় ৯০ হাজার শিশু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

সরকার জাতীয় শিশুশ্রম নিরসনে নীতি প্রণয়ন করেছে ২০১০ সালে। এ নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম মনিটরিং–এর কাজ চলছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে।

কোনো শ্রমিকের সন্তান যাতে শ্রমে নিযুক্ত না হয় সে জন্য শ্রমিকের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপে শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা বেড়েছে। ■

লকডাউনে আমার দিনলিপি

মুন্সী তাজীম মাহমুদ

অদৃশ্য করোনা আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্ত হচ্ছে ছোটো বড়ো সবাই। বাংলাদেশেও তিন মাস পেরিয়ে গেছে করোনার আক্রমণের। গোটা পৃথিবী আজ অসুস্থ। এ পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় প্রাণীর নাম মানুষ আমরা। প্রাণের ভয়ে আজ সবাই গৃহবন্দি। করোনা মানুষ থেকে মানুষে ছড়ানো ভয়ংকর রোগ। হাঁচি, কাশি, হাতের ছোঁয়ায় একজন থেকে আরেকজন আক্রান্ত হয়। ভাইরাস ফুসফুসসহ শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে। এই রোগ থেকে বাঁচতে হলে একজন মানুষ আরেক জন মানুষ থেকে দূরে থাকতে হয়। দূরে থাকার জন্য আমরা ঘরে থাকি। এর কোনো ঔষধ এখনো আবিষ্কার হয়নি, প্রতিষেধকও নেই। তাই ঘরে থাকাই বাঁচার প্রথম উপায়।

গোটা দুনিয়ায় একসাথে ছুটি। হঠাৎ কারো হাঁচির শব্দ শুনলে সন্ত্রাসীর বোমা ফাটানোর মতো ভয়ে শরীর–মন চুপসে যায়। এই বুঝি এল শত্রু। মানুষের বিপদে ছুটে যাওয়া মানুষ আজ আক্রান্তকে ফেলে যাচ্ছে। সৎকার করতে ভয় পাচ্ছে।

মরণঘাতি কোভিড-১৯ চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম ধরা পড়ে। এ ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় মুকুটের মতো দেখতে। জ্বর–সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, নাকবন্ধ, শ্বাসকষ্ট, স্বাদ-গন্ধ না পাওয়া এর লক্ষণ। মানুষের চলাচল বন্ধ করে লকডাউন করা হয়েছে সেই মার্চের শেষের দিকে। বাস, ট্রেন, বিমান, লঞ্চ সব বন্ধ। তাই আমরা আইসোলেশন, হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছি। দু'বেলা দাঁত মাজা, খাবার আগে ও শৌচ কাজের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, সাবান দিয়ে গোসল করা,পরিষ্কার কাপড় পরা, ঘন ঘন হাত ধোয়া, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের অভ্যাস করেছি। গরম পানি পান করা, কালিজিরা, মধু, আদা, লবঙ্গ, লেবু, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাচ্ছি। করোনা চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এর কথাও শোনা যাচ্ছে। বাস্তবে এগুলো প্রমাণিত ফলপ্রদ চিকিৎসা নয়। আবার ওষুধ ছাড়াও অনেকেই ভালো হচ্ছে।

বিপন্ন এই সময়ে লাইফ স্টাইল পালটে গেছে। মাস্ক এখন দৈনন্দিন পোশাক। দলে দলে আড্ডা নেই। আমরা বুঝে গেছি প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।

আমরা বুঝে না বুঝে খাদ্য, পানি, মাটি, বায়ু দূষণ করেছি। খেয়াল খুশিমতো ধ্বংস করেছি গাছপালা, নদনদী, পাহাড়, সমুদ্রকে। বিশ্বকে উষ্ণ করেছি। তাই মনে হয় প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে। অদৃশ্য ভাইরাস দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমরা প্রকৃতির উপর কত নির্ভরশীল। এ গ্রহের যাবতীয় প্রাণী, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, পাহাড়, সমুদ্র প্রকৃতিকে থাকতে দাও নিরাপদে, তাদের মতো করে। আজ প্রকৃতির কাছে কত তুচ্ছ আমরা!

বন্দি জীবনে বাড়তি বই, পুরনো পত্রিকা পড়া, লেখালেখি, আবৃত্তির চর্চা করে সময় কাটাই। শরৎ, রবীন্দ্র, নজরুল, মুজতবা, জসীমউদ্দীন আরো কত্তসব বই পড়ছি। কখনো গান শুনছি। আবার কখনো গুনগুন করে নিজেই গান করছি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বেঁচে থাকতে চাচ্ছি।

সেই মার্চ মাস থেকে স্কুলে যাওয়া হয় না যেন স্কুলের রুটিন ভুলতে বসেছি। স্কুলের টিফিন নিয়ে কাড়াকাড়ির কথা ভুলে গেছি। স্কুলের ব্যাগ, ইউনিফরমআমার দিকে চেয়ে যেন হাসছে। স্কুলের খেলার মাঠ হয়ত সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে। ডাকঘর নাটকের অমলের মতোই জানালার দৃশ্যগুলো হয়েছে সঙ্গী। এর মধ্যেই গেল রোজার মাস। টুপি–পাঞ্জাবি পরে বিকেলে বের হওয়া ভুলে গেছি। অনলাইনে ক্লাস করছি।

হুমায়ূন আহমেদের বহুব্রীহি নাটকের সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছি আসাদুজ্জামানের মাতৃহারা দুই শিশু। পড়ব না, স্কুলে যাব না। স্বাধীন হব। বাবার অনুমতি পেয়ে ঘরেই থাকল কয়েকদিন। বালিশ কেটে, প্যাকেট ভরা লবণ খাবারে ঢেলে তারা হাঁপিয়ে উঠল। বলল, বাবা স্বাধীনতা ভালো লাগে না। তেমনি আমাদের বিচরণ এখন ঘর, বারান্দা, ছাদ আর ব্যালকনিতে। আজ মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, বিরক্তিকর সেই স্কুলে ছুটে যেতে। বন্ধুদের আড্ডায় একাকার হতে। ভুলতে বসেছি সকাল থেকে মনে জেগে থাকা জুম্মার দিন, পার্থক্য নেই বাবার অফিস ডে আর ছুটির দিন। কয়েকদিনের খাবার ঘরে রেখে শীতনিদ্রা যাবার মতো এখন দিন কাটে। গৃহকর্মীর ছুটি। ফেরিওয়ালার হাঁকডাক শোনা যায়। দড়িতে ঝুলিয়ে কেনাকাটা করি, কে আবার বাজারে যায়। মাস্ক,হ্যান্ড গ্লাভস পরে সপ্তাহান্তে বাবার বাজারে বের হওয়া যেন যুদ্ধ যাত্রা। ঘরে বসেই সপরিবারে নরসুন্দরের কাজ সেরে নিই। লজ্জা ছেড়ে, অদক্ষ হাতে টাক মাথা করি। জীম, এক্সারসাইজ, পায়চারি করি। আমরা যারা সচেতন, তারা সরকারি নির্দেশ মানব, গুজবে কান দেব না। ভুল চিকিৎসা নেব না।

শহরে পাখপাখালি কম। তবুও অনেক বেলা পর্যন্ত টুনটুনি, দোয়েল কথা কয়। চড়ুই, শালিক অবলীলায় খেলা করে গ্রিলে, বারান্দায়। কোকিলের ডাক শুনি সারাবেলা। সাথে আছে শুধু কাকের বেসুরো গলা। অনেক পাখির কলরব মুখর করে রাখে শুনশান খুলনার বয়রা আবাসিক এলাকা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ৯ নম্বর রোডে কর ভবনের ৬ তলার কবুতরগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, ছন্দে ছন্দে খেলে,আবার ফিরে আসে। ছাদে উঠে দেখি ছাদবাগান আর দেখি প্রায় অর্ধেক শহর। অন্য বাড়ির দরজার চাইতে ছাদে পড়শিদের অনেক কাছে পাওয়া যায়। ছাদে দাঁড়িয়েও কথা হয়। ছাদের ফুলগুলো আদরের পরশে হেসে ওঠে। ঘুড়ি উড়াই। সব ছাদে যেন ঘুড়ির উৎসব। ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বিকশিত হচ্ছে কুটির শিল্প।

বাবা–মায়ের দেখাদেখি মনোবল অটুট রাখতে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকি, প্রফুল্ল থাকি। সাবান, হ্যান্ডওয়াশ, হ্যান্ডসেনিটাইজার, টিস্যুপেপার সর্বক্ষণের সঙ্গী। সবুজ চা পান করছি। গলায় গরম পানির গড়গড়া করছি, নাকে ভাপ নিচ্ছি। শৃঙ্খলা পরিচ্ছন্নতা মানছি। লুডু, ক্যারাম, ঘরোয়া আড্ডায় মাতি; আড়ি, সেইসাথে ঝগড়া কলহ বাড়তি। বাবা রেডিওতে, আমরা টিভি, ল্যাপটপে বসছি। মোবাইলে আলাপ করছি বেশি বেশি। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপডেট দেখি, মোবাইলে গেম খেলছি, অনলাইনেই কাগজ

পড়ি। ঘরে বসে ডায়েরি লিখছি। মনে হয় আমিও লেখক হয়ে উঠছি?

অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলায় লড়াকু আমরা আজ গোটা বিশ্বের সবাই। সম্মুখ যুদ্ধে ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ অন্যান্যদের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় প্রশাসন, পুলিশ, খাদ্য বিক্রেতা, ব্যাংকার, মিডিয়া কর্মী। আমরা সবাই লড়ছি স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে মুক্তির পথ। মসজিদে এতেকাফ করার মতো, আসহাবে কাহফ যুবকদের মতো, গৌতম বুদ্ধের ধ্যান করার মতো, থাইল্যান্ডের গুহায় আটকে পড়া বালকদের মতো, শীত নিদ্রারত ব্যাঙের মতো। ভুলতে বসেছি ছাপা পত্রিকার কথা; সেহেরির ঘণ্টা, বাজারের ইফতারি কেনা, ফাস্টফুড, পরোটা, সিঙারা, পুরির কথা; জুতা পালিশ,আয়রন, সেলুনে যাওয়া। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মে পর্যন্ত একটানা লকডাউন। এর মধ্যে ২০শে মে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিয়ে গেছে কতগুলো ফল-ফসল।

২৫শে মে পালন করলাম ঘরবন্দি ব্যতিক্রমী এক ঈদুল ফিতর। এবারই প্রথম নতুন কাপড় ছাড়া ঈদের দিন পার করলাম। বন্ধু বিহীন, বেড়ানো বিহীন, টিভি মোবাইলে মগ্ন গতানুগতিক একটা পানসে দিন।

ঋতু পরিবর্তনে রোগ বাড়ে। এবার তা কমেছে অনেকখানি। প্রকৃতি আজ স্বস্তিতে,আর আমরা আছি গৃহবন্দিত্বে। প্রকৃতির আকাশ–বাতাস নদী-সমুদ্রে বিষাক্ততা নেই। গাড়ির কালো ধোঁয়া নেই। শব্দ কোলাহল নেই, ভ্যা ভ্যা প্যা পু নেই। করোনার লাল সিগনালে থমকে আছে। পৃথিবী আজ শান্ত স্নিগ্ধ, সবুজাভ রৌদ্রোজ্জ্বল। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, ধূলায় ঢাকা পথঘাট এখন অনেক পরিষ্কার। সড়ক দ্বীপের ফুল, পাতাবাহার ঝরঝরে সজীবতা নিয়ে হাসছে। অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে গোটা বিশ্ব একেবারে শান্ত হয়ে আছে।

করোনার আরেক দিক আর্থিক ক্ষতি। ছোটো ছোটো কারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দোকানপাট বন্ধ। ছুটা কাজ নেই। উপার্জন কমে গেছে। বিচ্ছিন্ন থাকার এ যুদ্ধ জয়ের প্রাথমিক ফল হলো মানবিক সহমর্মিতা,বিপন্ন মানুষের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে যাওয়া। সরকার আর স্বেচ্ছাদানশীল অনেকে সাহায্য করছেন। সম্প্রদায় ভুলে শেষকৃত্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতিদিন দেখছি ছুটি নাই পরিচ্ছন্নতা কর্মীর। সম্মুখ যোদ্ধার মতো তার ভূমিকায় স্বস্তি পাই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনা সহসা যাবে না। লকডাউন উঠে গেলেও মাস্ক পরার অভ্যাসসহ আমাদের সতর্কতা দরকার আরো বেশি। আমরা যেন যেখানে–সেখানে থুথু ,ব্যবহৃত মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস না ফেলি। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শুদ্ধাচার মেনে চলি। স্কুল খোলার পরে, পরীক্ষার দিনেও সতর্ক হয়ে চলি।

এখন আমাদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা কমিয়ে ধরিত্রী পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রাণিকূলের জন্য অনুকূল অবস্থা ফিরিয়ে আনার লড়াই চাই। প্রকৃতির কাছে নিজেকে তুচ্ছ ভেবে গোটা বিশ্ব চরাচরকে ভালোবেসে রক্ষা করতে পারব। প্লেগ, কলেরা, গুটিবসন্ত তাড়ানো গেছে। বিজ্ঞানীরা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। করোনার টিকা, করোনার চিকিৎসাও একদিন আবিষ্কার হবে। বন্যার পর নতুন ফসলে জেগে ওঠে পৃথিবী। আশা রাখি করোনামুক্ত নতুন পৃথিবীতেও আমরা জেগে উঠব। শরীরের দূরত্ব বজায় রেখে মনের কাছে থাকব, মানবিকতায় সমুজ্জ্বল হবো। হ্যান্ডশেক উঠে যাবার পর নতুন সামাজিক রীতি নিয়ে আমরা জীবন সাজাব। আমরাও বের হব, নতুন জীবন পাব। থাইল্যান্ডের গুহা বালকদের মতো বাঁচার আশাবাদ খুঁজে পাই। আমরাও জিতব। এ লড়াইয়ে শক্তির ভূমিকা নেই। ভালোবাসার টানে, ত্যাগে, ধৈর্য্যে আমরা জিততে পারব। S.T.Coleridge যেমনটা বলেছেন: He prayeth best,who loveth best . ■

দশম শ্রেণি, খুলনা পাবলিক কলেজ, খুলনা।

করোনার গল্প

ফারহানা আমিন (হৃদিতা)

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ঘেমে গেছে হেনা। হেনা বলল, মা আর কতদূর? ওর মা বলল, এই তো আর কিছু পথ হাঁটলেই তোর নানাবাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে হেনা দূরের কিছু কোলাহল শুনতে পেল। হেনা জিজ্ঞেস করল, কোলাহল কীসের মা? মা বলল, মেলা হচ্ছে। কীসের মেলা? নববর্ষের মেলা, মা। ও এই মেলা দেখার জন্যই তো আমরা নানাবাড়ি যাচ্ছি। হ্যাঁ রে পাগলি। আর একটা সাঁকো পার হলেই হেনার নানাবাড়ি। নানাবাড়িতে গিয়ে পড়ার টেনশন নেই। খাওয়া, খেলাধুলা আর ঘুরে বেড়ানো। এজন্যই তো বায়না ধরে ও নানাবাড়ি যাচ্ছে। আগে থেকে ওদের আসার কথা জেনে নানু হরেক রকমের পিঠা, শোল মাছের ঝোল তরকারি, হেলেঞ্চা শাক আর মুরগি রান্না করেছিল। খাবার খাওয়ার পর হেনা সমবয়সিদের নিয়ে কানামাছি, কুতকুত খেলল।

বিকেলে ওরা সবাই নববর্ষের মেলায় গেল। গ্রামের শেষ মাথায় বটের ছায়ায় নদীর ধারে বসেছে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। ক্যাঁচরক্যাঁচর শব্দে নাগরদোলা দুলছে। ছেলেমেয়েরা হইহল্লা করে নাগরদোলায় চেপে বসেছে। কবুতরের খোপের মতো বড়ো একটা বাক্সের দু-দিক থেকে চোখ লাগিয়ে ছোটোরা কী সব দেখছে। মা ওটা কী? ওরা কী দেখছে? মা বলল, ওটা বায়োস্কোপ। ওরা ভেতরের মজার মজার সব ছবি দেখছে। আম্মুকে বলে হেনা দেখল পুতুলনাচ। শলার পুতুলগুলোর নাচ দেখে ও ভীষণ মজা পেয়েছে।

মেলায় আর একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল রঙিন হাড়ি পাতিলের দোকান, মাটির ব্যাংক, বাঁশ-বেতের তৈরি ডালা, কুলা, হাতপাখা। কামারের তৈরি দা,কাস্তে, ছুরি ,খুন্তি, বটি। কাঠের তৈরি পিঁড়ি, বেলুন, জলচৌকি, মিষ্টি, মুড়িমুড়কি, মটকা, খই–বাতাসার দোকান। পাশেই ছিল মাটির পুতুল, বাঁশি, বল, গুলতি, লাটিম। ছোটো ছোটো বউ এর মতো পুতুল ও টেপা পুতুল। হেনা কতকগুলো টেপা পুতুল কিনে খুব খুশি। মেলায় কেনা শখের হাড়িতে মটকা–বাতাসা কিনে খেতে থাকল হেনা আর হিমু। একটা ডুগডুগি কিনে হিমু বাজাতে থাকল। ওদের নানা–নানুর জন্য কিনল পানের ডাবর। মেলার অন্য

ধারে ছিল মুখোশের দোকান। হেনা আর হিমু দুজনে দুটি মুখোশ কিনে পড়ে ফেলল। হিমু বাঘের মুখোশ পড়ে হঠাৎ হালুম করতেই হেনা ভয় পেয়ে গেল। শেষ বেলায় ওরা নাগরদোলায় চড়ল। আম্মুকে হেনা বলে, আম্মু শহরে এমন মেলা হয় না কেন? শহরে তো সবাই ব্যস্ত তাই,বলে ওর আম্মু।

মেলা থেকে ফিরলে নানা-নানু পানের ডাবর পেয়ে, খেলনা ও পুতুল দেখে খুশি হন। নানু বলেন, আমাদের সময় তো আমরা মেলায় যেতে পারতাম না। ছোটো বেলায় তোমার নানার ঘরে এসেছি। তখনো পুতুল খেলার দিন ফুরায়নি। খুব কান্না করতাম। তোমার নানা মেলা থেকে এরকম পুতুল কিনে এনে দিলে আমার কান্না থামত। এরপর নানু হেনাকে বলল, সুচে সুতা পড়িয়ে দাও না। হেনা নানুর সুচে সুতা পড়িয়ে দিল। তারপর নানু নিজেই ছোটো ছোটো কাপড় সেলাই করে তার থলিতে ধানের তুষ পুরে,তুলা ভরে সুন্দর সুন্দর সব খেলনা আর পুতুল গড়ে দিলেন। মুরগির পালকে আলতা মেখে তৈরি করলেন মনকাড়া সব ফুল। গোসলের আগে তৈরি করে দিলেন মাটির খেলনা চুলা। হেনা শহরে নিয়ে যাবে। রান্না করবে। খুব মজা হবে।

...'এ্যাই হেনা ওঠ। খেতে আয়। তোর নানাভাই-নানু শতরঞ্চি পেতে বসে আছেন। বড়ই আচার দিয়ে খিচুরি খাবি।'ওর মা ডাকতে থাকে।

এসএসসি পরীক্ষার পরে হেনা নানা বাড়ি এসেছিল। একটানা পড়ার ক্লান্তিতে ঘুমটা লম্বা হয়ে গিয়েছিল। ঘুমরাজ্যে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল শৈশবের বৈশাখি মেলায়। ঘুম ভেঙে মাইকের ঘোষণায় ও শুনতে পায়, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হবেন না। যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। করোনার মহামারি থেকে বাঁচতে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার অভ্যাস করুন। ■

একাদশ শ্রেণি, শহীদ আবদুল জব্বার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুর

বাইরে থেকে ফিরে করোনা সংক্রমণ বিষয়ে সতর্কতা

পরিধানের কাপড় পরিবর্তন করুন ও ধুয়ে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট একটি ঝুড়িতে রাখুন

বাইরে থেকে কোনো কিছু নিয়ে আসলে তা ব্লিচযুক্ত পানি ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন

পরিহিত জুতা খুলে বাসার বাইরে জুতার বাক্সে রাখুন

বাসায় প্রবেশের পর কোনো কিছু হাত ধোয়া ছাড়া স্পর্শ করবেন না

বাইরে থেকে এসে গোসল করুন। সম্ভব না হলে শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন

পোষা প্রাণীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলে তাকে ভালোভাবে গোসল করাতে হবে

ক্ষুদ্র হতে শিক্ষা

মো. মাঈন উদ্দিন

বিশাল এক মাঠ। মাঠের এককোণে পিঁপড়াদের বসবাস। তারা দল বেধে বসবাস করে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া। পিঁপড়াদের একজন সরদার আছে। সরদারের আদেশ সকল পিঁপড়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সরদার কোনো দলকে আদেশ দেয় নতুন বাসা নির্মাণ করতে, কোনো দলকে নদী হতে পানি সংগ্রহ করতে, কোনো দলকে খাদ্য সংগ্রহ করতে। প্রত্যেক দল ঠিকঠাকমতো সরদারের আদেশ পালন করে।

এছাড়াও চলার পথে রাস্তায় কোনো খাবার পেলে পিঁপড়ার দল ঐ খাবার বাসায় আনতে সর্বাত্নক চেষ্টা চালায়। অল্প সংখ্যক পিঁপড়ার পক্ষে কোনো বড়ো খাবার টেনে আনা সম্ভব না হলেও তারা নিরাশ হয় না, চেষ্টা চালিয়েই যায়। 'পারিব না'-এ কথাটি তারা কখনো বলে না। এর কারণ, সরদার তাদের বলেছে-আমরা পরিশ্রমী জাতির যে খেতাব পেয়েছি, এই খেতাব আমাদের ধরে রাখতে হবে। পিঁপড়া সরদার আরো বলেছে-আমরা সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে পরিচিত। এ খ্যাতিটিও আমাদের ধরে রাখতে হবে।

তাই কোনো কাজে যাওয়ার পথে সবাই লাইন ধরে শৃঙ্খলভাবে হাঁটে। কেউ কারো আগে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে না। পিঁপড়াদের মধ্যে একটি পিঁপড়া খুব বয়স্ক। এই বুড়ো পিঁপড়াটি মাঝে মাঝে মাঠের এক স্থানে বসে থাকে। কোনো কাজ করতে পারে না। সে বসে বসে দেখে মাঠের মধ্যে প্রতিদিন কিছু রাখাল বালক গরু চড়াতে আসে। রাখাল বালকদেরও একজন সরদার আছে। কিন্তু তারা সরদারের কথা অমান্য করে প্রায়ই একে অন্যের সাথে ঝগড়া করে। রাখাল বালকদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে বুড়ো পিঁপড়ার খুব রাগ হয়। একদিন ঝগড়া করার সময় বুড়ো পিঁপড়া এগিয়ে গেল। রাখাল বালকদের ডাকল। প্রথমে রাখাল বালকেরা বুঝতে পারল না কে তাদের ডাকছে। পরে তারা বুঝতে পারল একটি বুড়ো পিঁপড়া তাদের ডাকছে। তারা আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে, পিঁপড়াও কথা বলতে পারে! বুড়ো পিঁপড়া তাদের ঝগড়ার কারণ জানতে চাইল। রাখাল বালকেরা একে অপরকে দোষ দিয়ে অভিযোগ করল। সব শুনে বুড়ো পিঁপড়া বলল-শোনো বালকেরা, পিঁপড়াদের দিকে তাকাও। হাজার হাজার পিঁপড়া লাইন ধরে এক স্থান হতে আরেক স্থানে আসা-যাওয়া করে, কেউ কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। অথচ তোমরা মানুষেরা কে কার আগে যাবে, এই প্রতিযোগিতায় রাস্তায় জ্যাম সৃষ্টি করো।

লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া বাসায় একত্রে বসবাস করে, কখনো দেখেছ তাদের ঝগড়ায় লিপ্ত হতে? অথচ তোমরা চার-পাঁচজন মানুষ মিলেমিশে থাকতে পারো না। তোমরা না সৃষ্টির সেরা জীব? তাহলে তোমাদের ধৈর্য্য ও সহ্য ক্ষমতা এত কম কেন? এবার বালকেরা তাদের ভুল বুঝতে পারল। তারা একে অপরের মুখের পানে তাকালো এবং বলল, সত্যিই তো! আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও ঝগড়া করি। একে অপরের কাজ বা মতামতের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখাই না। অথচ লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া মাসের পর মাস ঝগড়া-বিবাদহীনভাবে বসবাস করে। রাখাল বালকেরা হাতে হাত রেখে শপথ করল আর কখনো ঝগড়া করবে না। ■

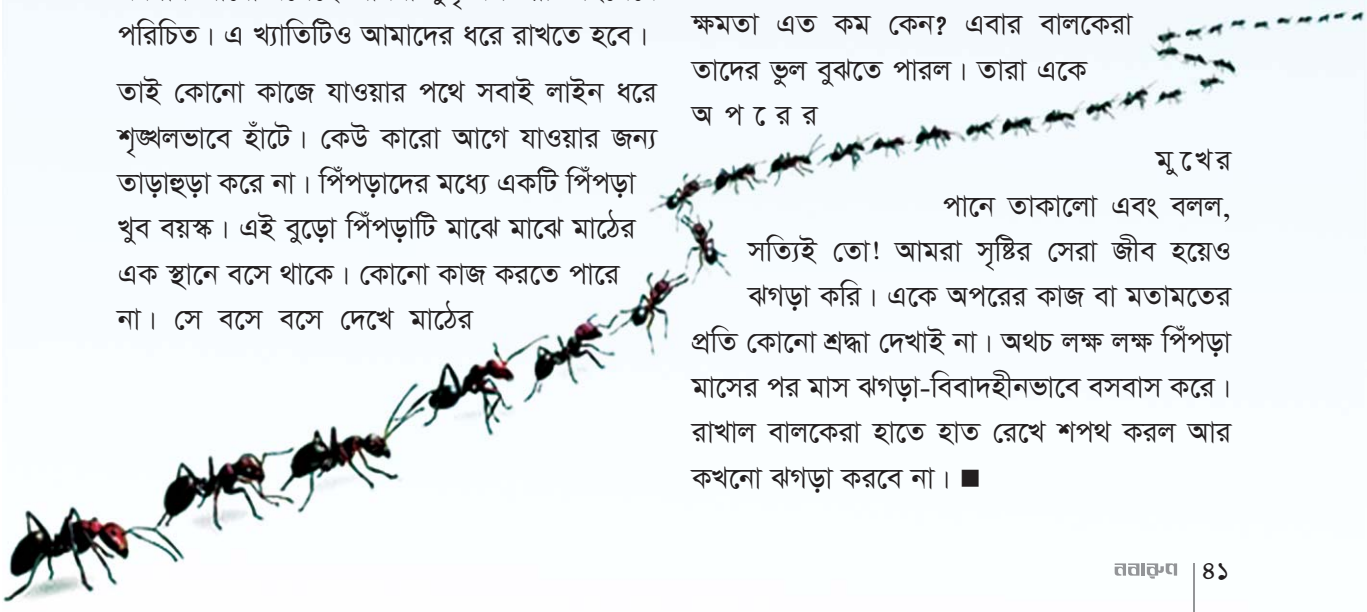

কবিতাগুচ্ছ

বাবা

মেশকাউল জান্নাত বিথি

বাবা আমার মাথার ওপর
থাকেন ছাতার মতো
মায়া ভরা মুখখানি দেখলে পরে
ভুলে যাই দুঃখ আছে যত।
বাবা আমার চলার পথের
একমাত্র অনুপ্রেরণা
বাবা-ই আমার
বেঁচে থাকার স্বপ্ন সাধনা।

৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

দেশের এমন দুঃসময়ে

এইচ এস সরোয়ারদী

দেশের এমন দুঃসময়ে
কাঁপছে মানুষ, কাঁপছে টিয়ে
আসুন ভাই সবাই মিলে
ভাবব এবার দেশকে নিয়ে?
দেশের এমন দুঃসময়ে
সব ভেদাভেদ–হিংসা ভুলে
কেউ কি দিবেন একটি রুটি
ক্ষুধার্তদের মুখে তুলে?
দেশের এমন দুঃসময়ে
রইব না আর চুপটি করে
যার যা আছে বিলিয়ে দেব
মনটা খুলে দু-হাত ভরে।

গ্রীষ্মের দুপুর

আমিনুল ইসলাম কাইয়ুম

ঘাম ঝরে - দরদর,
গরমের - চোটে।
তবু দামাল ছেলে – ওই
আমবাগানে - ছোটে।
এই পাড়া - ওই পাড়া - হেঁটে হেঁটে,
কচি - কচি শিশুরা।
কচি আম - কুড়িয়ে - কেটে কেটে,
খাচ্ছে দেখো - শিশুরা।
কাঠফাটা – ওই রোদে,
শুকিয়ে – পুকুর।
বাতাস যেন - বহ্নি,
গ্রীষ্মের - দুপুর।

বলতে পারো

সরদার আবুল হাসান

যায় কি গোনা মোট কতটা
নীল সাগরের ঢেউ
দূর আকাশে কয়টি তারা
বলতে পারো কেউ?
বলতে পারো দিনের বেলা
সূর্য যখন উঠে
কোথায় তখন চন্দ্র–তারার
মুচকি হাসি ফোটে?
রাতের বেলা আকাশ জুড়ে
জোছনা ঝলোমলো
তখন কেন তারার মেলা
হঠাৎ মলিন হলো?
বলতে পারো ঝরনাধারা
কেন পাগল হয়ে
ছুটছে নদীর মোহনায়
অহর্নিশি ধরে।

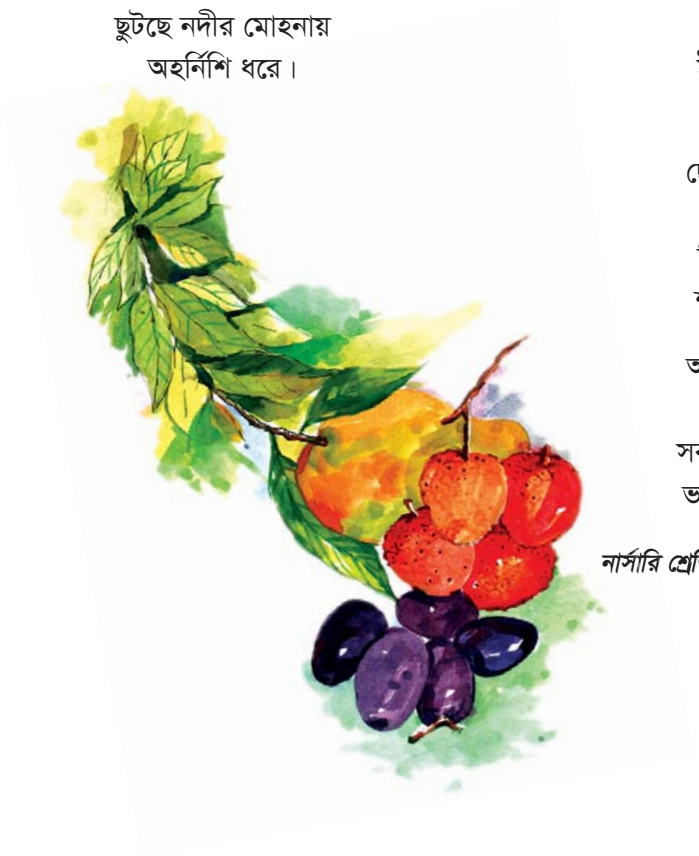

বৃষ্টি

মুশফিক মিদুল

বৃষ্টির মাস আষাঢ় শ্রাবণ
মানে নাকো শাসন বারণ
দিবানিশি ঝরতে থাকে
টুইটম্বুর সব কুসুমকানন।

পড়ার ফাঁকে মেঘের ডাকে
বাতায়নে দিয়ে উঁকি
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
বৃষ্টির ছড়া পড়ছে খুকি।

৭ম শ্রেণি, হায়দার আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ফল

ইরফান হোসেন

ছোটো–বড়ো সকলের
খেতে হবে ফল
নিয়মিত খেলে পরে
শরীরে আসবে বল।

আম জাম কাঁঠাল লিচু
বেশি করে খাব
সবগুলো খাওয়ার আগে
ভালো করে ধুয়ে নিব।

নার্সারি শ্রেণি, মা কিন্ডারগার্টেন স্কুল, যশোর।

গল্প

মীনা যেভাবে প্রথম হয়েছে

সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্

বাবা তিন দিনের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়ি। ছোট্টো একটা মেয়ে নিয়ে এসেছেন। প্রায় আমার বয়েসি হবে। ছিপছিপে মেয়েটির শক্ত শরীর। তার চেহারায় কষ্ট করে বেঁচে থাকার ছাপ রয়েছে।

মা মেয়েটিকে দেখে বললেন, 'এদ্দিন পরে কোত্থেকে জানি একটা পোড়া লাকড়ি নিয়ে ঘরে এসেছে। এ মেয়ে দিয়ে আমার কোন কাজটা হবে শুনি?' মা মেয়েটিকে খুব যোগ্য মনে না করলেও শেষে মেনে নিলেন।

মেয়েটির নাম মীনা।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মা মীনার ভক্ত হয়ে গেলেন। চমৎকার মেয়ে সে। রীতিমতো ছুটোছুটি করে কাজ করে। তার কাজে খুঁত ধরতে পারেন না মা। বাসার সবাই খুশি।

মজার ব্যাপার হলো মীনা ভেতরে ভেতরে আমাকে খুবই পছন্দ করে। আমিও তাকে খুব পছন্দ করি। তবে কেউ কাউকে পছন্দের কথাটা বলি না। সে সুযোগ পেলেই আমার পড়ার টেবিলের চারপাশে ঘুর ঘুর করে। বই উলটায়। বিড়বিড় করে পড়ে। আবার মা'র শব্দ পেলেই সে তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যায়।

একদিন দেখি, মীনা খাটের তলা ঝাড়ু দিতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চুপি চুপি গিয়ে দেখি সে বই পড়ছে। সেখানে কয়েকটা বই পড়ে আছে।

আমি বললাম, 'তুমি কি পড়তে পারো?'

মীনা ঝটপট করে উঠে বলল, 'আমি কেলাস থিরি পর্যন্ত পড়ছি। আমি লেহাপড়ায় খুব বালা আছিলাম। অভাবের জ্বালায় আর পড়তে পারি নাই। আমার পড়তে খুব মন চায়, আফা আমারে পড়তে দিবেন?'

মীনার জন্য আমার খুব মায়া হলো। কিন্তু মা'র কাছে ওর পড়ালেখা করার কথা বলার সাহস পেলাম না।

একদিন মীনার সাথে অনেক কথা বললাম। তাকে খুব মেধাবী বলে মনে হলো। পরে মীনাকে কানে কানে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিলাম।

দুই.

গভীর রাতে মীনা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। মা-বাবা দৌড়ে গেলেন। মা বললেন, 'কী হয়েছে তোর, এভাবে চিৎকার করছিস কেন!'

মীনা বলল, 'আমি এই ঘরে একলা থাকতে পারুম না।'

মা বললেন, 'এদ্দিন থাকতে পারলি আর আজ হঠাৎ তোর কী হলো শুনি?'

'একা থাকলে আমারে বোবায় ধরে।' বলে মীনা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা একটু আদরের স্বরে বললেন, 'বোবা দেখছসনি তুই।'

মা ভেংচি কেটে বললেন, 'বোবা দেখছসনি তুই, বোবা কি দেখা যায়? দেখা গেলে তো এখন দরজা লাগিয়ে সমানে পিটাইতাম।'

তাহলে মীনাকে এখন কোথায় রাখা যায়?

অবশেষে মীনাকে আমার রুমে নিয়ে এসে মা বললেন, 'মীনা আপাতত এই রুমেই ঘুমাক।'

তিন.

আমাদের প্রথম পরিকল্পনাটা সুন্দরভাবে সফল হয়ে গেল। দরজা লাগিয়ে আমি আর মীনা আনন্দে লাফালাফি করতে লাগলাম।

আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমার ক্লাস ফোরের সব বই মীনাকে দিলাম। রাতে দরজা লাগিয়ে আমি পড়াই তাকে, সে খুব আনন্দের সাথে পড়ে। আমি তাকে নিয়মিত পড়াতে লাগলাম। এত মেধাবী মেয়ে আমি আর দেখিনি। একবার বলে দিলেই হলো। চমৎকার স্মরণশক্তি তার। তাকে নিয়ে আমি মনে মনে আরো একটা পরিকল্পনা করলাম।

আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান। প্রতিবারের মতো এবারও জন্মদিনে সবার সামনে আমাকে একটা ভালো কাজ করার শপথ করতে হবে।

আমি অনুষ্ঠানে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললাম, 'আমার এবারের শপথ হলো, আমি আমাদের মীনাকে শিক্ষিত করে তুলবই তুলব।' মা আমাকে কী যেন বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু অতিথিদের হাততালিতে কিছু বলতে পারলেন না। মজার ব্যাপার হলো অনুষ্ঠানে সবাই আমার শপথবাক্যের খুব প্রশংসা করলেন।

চার.

এবার আমার শপথবাক্য অনুযায়ী কাজ করার পালা। মা'র খুব ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে কিছুই বলতে পারছেন না, কারণ এটা আমার একটি প্রতিজ্ঞা। অবশ্য মীনা বাসার কাজ শেষ করেই রাতে পড়তে বসে যায়।

আমি তাকে বাবার সহযোগিতায় পাশের প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি করিয়ে দিলাম। এখন সে আগের চেয়ে বেশি আনন্দে কাজ করে আর পড়ে।

মা রাগে গজর গজর করে আমাকে বললেন, 'মাস্টারি

মোছা. একি, ৪র্থ শ্রেণি, পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর-১।

করার খুব শখ হয়েছে তোমার। গ্রাম থেকে আনা মেয়েকে ভর্তি করিয়ে দিলে স্কুলে। পরীক্ষার পর যদি খালি তোমাদের রেজাল্ট খারাপ হয় তবে মনে রেখো, ছাত্রী-শিক্ষক দু'জনকেই বাড়ি ছাড়া করব আমি।'

মনে মনে জেদ ধরে মীনাকে পড়াতে লাগলাম। সেও জেদ ধরে বেশি বেশি করে পড়তে লাগল। মীনা পরীক্ষা দিল। বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হলো। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়ে মীনা চতুর্থ থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠল। আনন্দে আমরা বাসায় লাফালাফি আর হইচই করতে লাগলাম। মা ও বাবাকে ফোন করে মীনার সাফল্যের খবরটা জানিয়ে দিলাম। তারা অফিস থেকে আসার সময় মিষ্টি নিয়ে এসে একটি অনুষ্ঠান করে ফেললেন। মীনার সাফল্যের সংবাদটা মা ও বাবা সব আত্মীয়স্বজনকে জানিয়ে দিলেন। চারদিক থেকে সবাই আমাকে ও মীনাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। আনন্দে সবার মুখ চিকচিক করতে লাগল।

পাঁচ.

মা-বাবা দু'জনে গিয়ে মীনাকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বাসায় এসে মা আঙুল খাড়া করে মীনাকে বললেন, 'কামকাজ কমিয়ে দিয়ে এখন থেকে ভালো করে লেখাপড়া করতে হবে, মানসম্মানের ব্যাপার। ফাইভে বৃত্তি না পেলে আত্মীয়স্বজনকে মুখ দেখাতে পারব না আমি।'

আমরা অনেক উৎসাহ নিয়ে পরিশ্রম করতে লাগলাম।

আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

মীনা পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে গেল। আনন্দ আর ধরে না। মা-বাবাও খুশিতে টগবগ করতে লাগলেন। সবাইকে দাওয়াত করে অনুষ্ঠান করলেন। মা ও বাবা দাওয়াতপত্রে লিখেছেন, 'আমাদের বাসায় ছোট্ট একজন ছাত্রী আর ছোট্ট একজন টিচার আছে। এই দুই 'ছোট্ট' মিলে একটা বড়ো কাজ করে ফেলেছে। এদের আশীর্বাদ করার জন্য আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।'

মজার ব্যাপার হলো, এবারের অনুষ্ঠানের দিন মা-বাবা দু'জনেই মীনাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ■

বোকার দেশে সফর

জুয়েল আশরাফ

শেষমেষ পাখাল ভাইয়ের সিদ্ধান্ত চরমে এসে পৌঁছেছে- এই চালাক চতুর দেশে এক মুহূর্ত আর থাকবেন না। বোকার দেশে চলে যাবেন। আমরা সবাই বিচলিত বোধ করলাম। কারণ পাখাল ভাই-ই আমাদের মহল্লার একমাত্র মহাপুরুষ যিনি রোজ বিকেলে আমাদের দলটাকে ভোম্বলের দোকানের চটপটি খাওয়ান। তিনি চলে গেলে আমাদের উপায় কী হবে! ভেবেই আমরা দিশেহারা। আর যাবেনই যখন বোকার দেশে কেন, আমেরিকার মতো বুদ্ধিমান রাষ্ট্রে নয় কেন? পাখাল ভাইয়ের এক জবাব-যে দেশের মানুষ কাউকে ঠকাতে পারে না, ঠকানো কী

জিনিস জানেই না- এমন বোকা দেশেই চলে যাব। আমরা ভারী আশ্চর্য হই, এমন বোকা দেশ কোথায়? কোন মহাদেশে সেই দেশের জন্ম? পাখাল ভাই বুদ্ধিমানের হাসি হেসে বললেন, আছে আছে, এমন দেশও আছে। শুনবি তোরা সেই বোকা দেশের বোকা মানুষের আজব কাহিনি? আমরা শোনার জন্য সবাই নিজেদের কানকে পরিষ্কার করে এনেছি। পাখাল ভাই বলা আরম্ভ করলেন—

এক বোকা দেশের একটি গ্রাম। সেই গ্রামে দুই বোকা বন্ধু বাস করে। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব। কেউ কারোর খোঁজ না রেখে একদিনও থাকতে পারে না। একজনের বাড়িতে যদি ভালো খাবার রান্না হয় দ্বিতীয় বন্ধুকে না দেওয়া পর্যন্ত প্রথম বন্ধু খায় না। দ্বিতীয় বন্ধুও নিজের বাড়িতে ভালো কিছু রাঁধলে খাওয়ার শুরুতেই প্রথম বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে তবেই খাবে। এমন মধুময় ভালোবাসা দুজনের। তাদের দুজনকে সবাই দেখে বলে- মানিকজোড়া। দুজনের এত ভাব, চলতে-ফিরতে কেউ কারোর হাত ছাড়ে না। হাত ধরেই রাখে। একদিন হাত ধরে দুজনে পথ চলছে। পথের মধ্যে একটা গাছের সঙ্গে তাদের দুজনের হাত আটকা পড়ল। পথের মাঝখানে গাছ, পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই হয় অথবা হাত ছেড়ে দিয়ে দুজনেই গাছের পাশ দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ বুদ্ধিটুকুও তাদের ছিল না। লোকজন এসে বলাবলি করল- হায় হায় এখন তো দুজনেরই হাত কাটতে হবে। তা না হলে এরা দুজন সামনে এগোতে পারবে না। হাত কাটতে হবে শুনে দুজনেই কেঁদে উঠল, শরীরের প্রয়োজনীয় অঙ্গ কাটা পড়বে। হাত কাটার আগে কয়েকজন লোক পরামর্শ করে এই দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোককে খবর পাঠালো। খবর পেয়ে জ্ঞানী লোকটি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত। সে গাছের চারদিক পর্যবেক্ষণ করল আর ভাবতে লাগল হাত না কেটেই এই দুটি মানুষ কীভাবে সামনে এগোতে পারে। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা বুদ্ধি বের করল। তার বুদ্ধি এই- কারোর হাত না কেটে বরং গাছটিকে কেটে ফেললেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। বোকা দেশের বোকা মানুষগুলো জ্ঞানী লোকটির পরামর্শে গাছটিকে কাটল এরপর দুই বন্ধু হাত ধরে আবার হাঁটতে পারল। ■

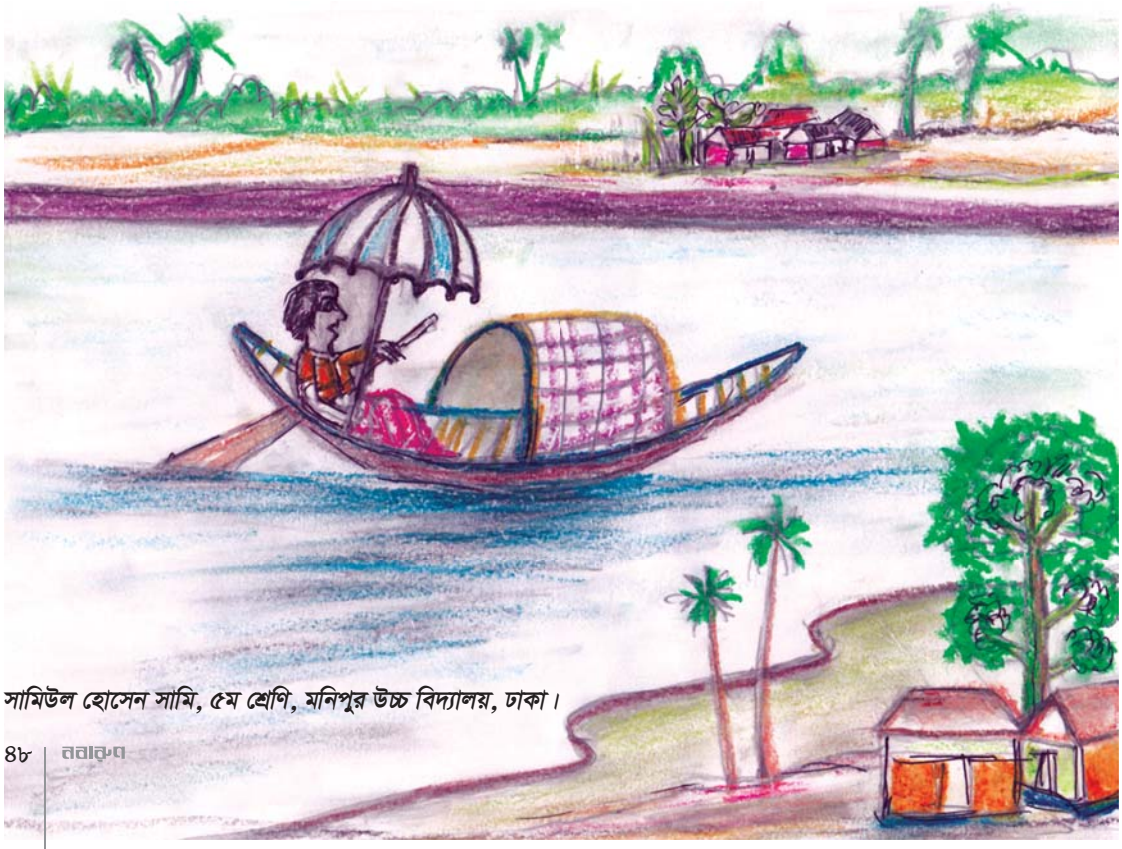

সামিউল হোসেন সামি, ৫ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

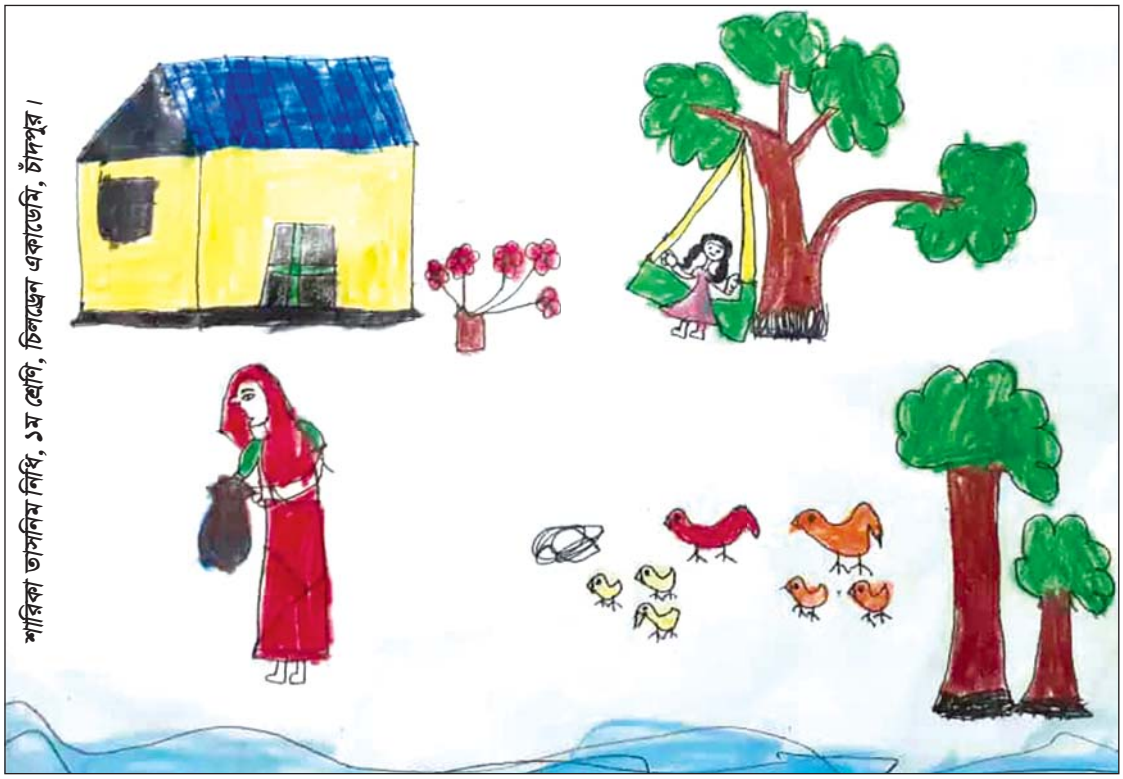

শারিকা তাসনিম নিধি, ১ম শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর।

পলি ও
হাঁসের ছানা

অনিক মাযহার

হাঁসের ছানাগুলো মায়ের সাথে থেকে শিখছে অনেক কিছু। খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে, পুকুরে সাঁতার কাটা, সবকিছুই করে থাকে মায়ের সাথে। যতদিন পর্যন্ত ওরা স্বাবলম্বী না হবে, ততদিন ওরা এভাবেই থাকবে। তাই মা হাঁস ছানাদের বলেছে, বিপদে পড়লে বিচলিত না হয়ে হতে হবে কৌশলী। তাহলে কোনো না কোনো সমাধান আসবেই। তাদের চারপাশে অনেক দিন থেকে বেড়েছে বেজির উৎপাত। বেজি হাঁস বা হাঁসের ছানা বাগে পেলেই কামড়ে ঝোপে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

ঠিক এমন ভাবেই একদিন একটা ছানা হয়ে গেল দলছুট। আর যা ঘটার ঠিক তাই ঘটল! সুযোগের অপেক্ষায় থাকা বেজি ধরল ছানাকে। কী করবে? কী করবে ভেবে ছানা শুরু করল চিৎকার। আর তার চিৎকার শুনে পাশ থেকে ছুটে এল পলি। পলি হলো এ পাড়ারই একটি কুকুরের নাম। যে অনেক দিন যাবৎ বাস করছে এখানে। আর এখানকার মানুষ, ভালোবেসে তার নাম দিয়েছে পলি। সেই পলির যাওয়াতেই ভয়ে পালাল বেজি।

সুরক্ষিত ভাবেই এ যাত্রায় বেঁচে গেল ছানাহাঁস। যদিও একটু আতঙ্কিত ছিল, তবুও স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে বলে উঠল মা তো ঠিকই বলেছিল-বিপদ যেমন আসবে, তেমনই বিচলিত না হয়ে সঠিক উপায় অবলম্বন করলে সমাধানও মিলবে। এভাবেই ছানাহাঁস আবারো ফিরে গেল মায়ের কোলে। ■

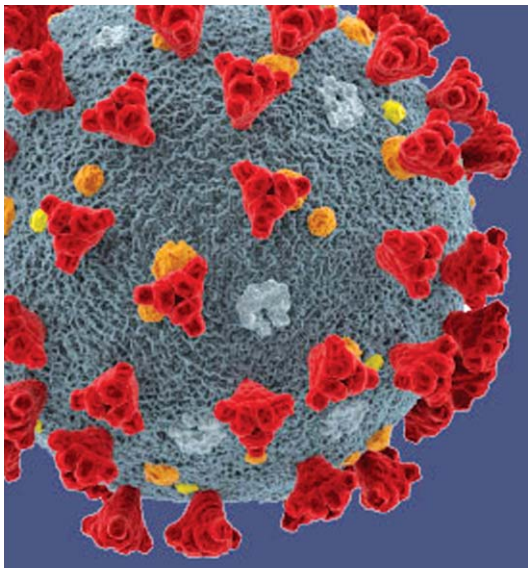

নিবন্ধ

অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাস

ওবায়দুল মুন্সী

বিশ্বে একের পর এক নতুন ভাইরাসের সূত্রপাত ঘটছে। কোনো না কোনো দেশ থেকে নতুন করে নতুন নামে সে মানব শরীরে প্রবেশ করে প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। নিপা ভাইরাসের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার দেখা দিয়েছে নভেল করোনা ভাইরাস। নতুন ভাইরাসটির জেনেটিক কোড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি অনেকটাই সার্স ভাইরাসের মতো।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসের জন্ম হয়। ব্রিটিশ জার্নাল ন্যাচারে প্রকাশিত একটি গবেষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়, গবেষকরা চীনের উহান শহরের একটি হাসপাতালে ৭ জন করোনা রোগীদের পরীক্ষা করে ৬ জনকেই করোনা আক্রান্ত পেয়েছিলেন। আর এদের সবাই ছিল সামুদ্রিক খাবার বিক্রির সাথে যুক্ত।

গবেষকদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, আক্রান্ত শরীরে করোনা ভাইরাস প্রায় ৯৬ শতাংশেই বাদুড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। কিছুদিন আগেও চীনে বাদুড় স্যুপ খাওয়ার একটি ছবি বিশ্বজুড়ে বেশ ভাইরাল হয়েছিল। করোনা গবেষকরা ধারণা করছেন যে, বাদুড় থেকেই করোনা এসেছে।

২০১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর চীনের উহান শহরের আরেকটি হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত একজন রোগীর ওপর চালানো আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় বাদুড়ের সাথে তার ভাইরাসের ৮০ শতাংশ মিলে গেছে। তবে শুধু বাদুড়কেই করোনার জন্য দায়ী করতে চান না বর্তমান বিজ্ঞানীরা। আরো কোনো কারণ আছে কিনা সেটা গবেষণায় জানানো হবে।

সারা বিশ্ব আজ করোনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কোথায় কখন কী হবে, কেউ তা জানে না।

চীন, ইতালি, স্পেন, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোতে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে এই করোনা ভাইরাস। যার প্রভাব বাংলাদেশেও এসে পড়েছে।

সরকারের অক্লান্ত সহযোগিতায় আমরা এই অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করছি। বাংলাদেশ সরকারের করোনা নিয়ে সচেতনতার জন্যই আমরা করোনার মোকাবিলা করতে পারছি। জনসচেতনতা বাড়াতে একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলাহয়েছে যে, নভেল করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীর কাছ থেকে অন্তত দুই হাত দূরে থাকতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তির

এ রকম রোগীর কাছে খুব বেশি যাতায়াত করতে হয় তাহলে, প্রত্যেকবার জীবাণুনাশক সাবান দিয়ে ভালো করে নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হবে। যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা নিষেধ করা হয়েছে।

সরকারের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে আমরা জয় করার চেষ্টা করছি করোনাকে। আমাদের ডাক্তার-নার্স, পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ প্রশাসনের সেবাকার্যে নিয়োজিত সবাইকে ভালো প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে। কারণ-কখন কী ঘটে যায় আমরা কেউ তা বলতে পারছি না। সেবাকার্যে নিয়োজিতদের সুরক্ষিত রাখলে আমরাও সুস্থ হতে পারব এবং সুরক্ষিত হব। সরকার দেশের জনগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, সবার জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসা সুব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিয়েছেন দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণেই একের পর এক ভাইরাস বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। আর সেটা কোনো না কোনো মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসে আক্রমণ করছে।

এসব কেন হচ্ছে? আসলে জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষিত হওয়ার জন্যেই এমনটা হচ্ছে। অবাধে বনের গাছপালা নিধন করাতে বিষাক্ত পোকামাকড় ও পশুপাখি লোকালয়ে এসে বসবাস করার ফলে এই নিত্যনতুন ভাইরাসের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে অদূর ভবিষ্যতে মানব সমাজ হুমকির মুখে পড়বে। তখন হয়ত আর কোনো গবেষণা কাজে আসবে না, সুন্দর এই পৃথিবীর ধ্বংসলীলা ঘটবে। তাই আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। ■

সুহিন হোসেন, ৮ম শ্রেণি, আল কাউসার স্কুল, কুমিল্লা।

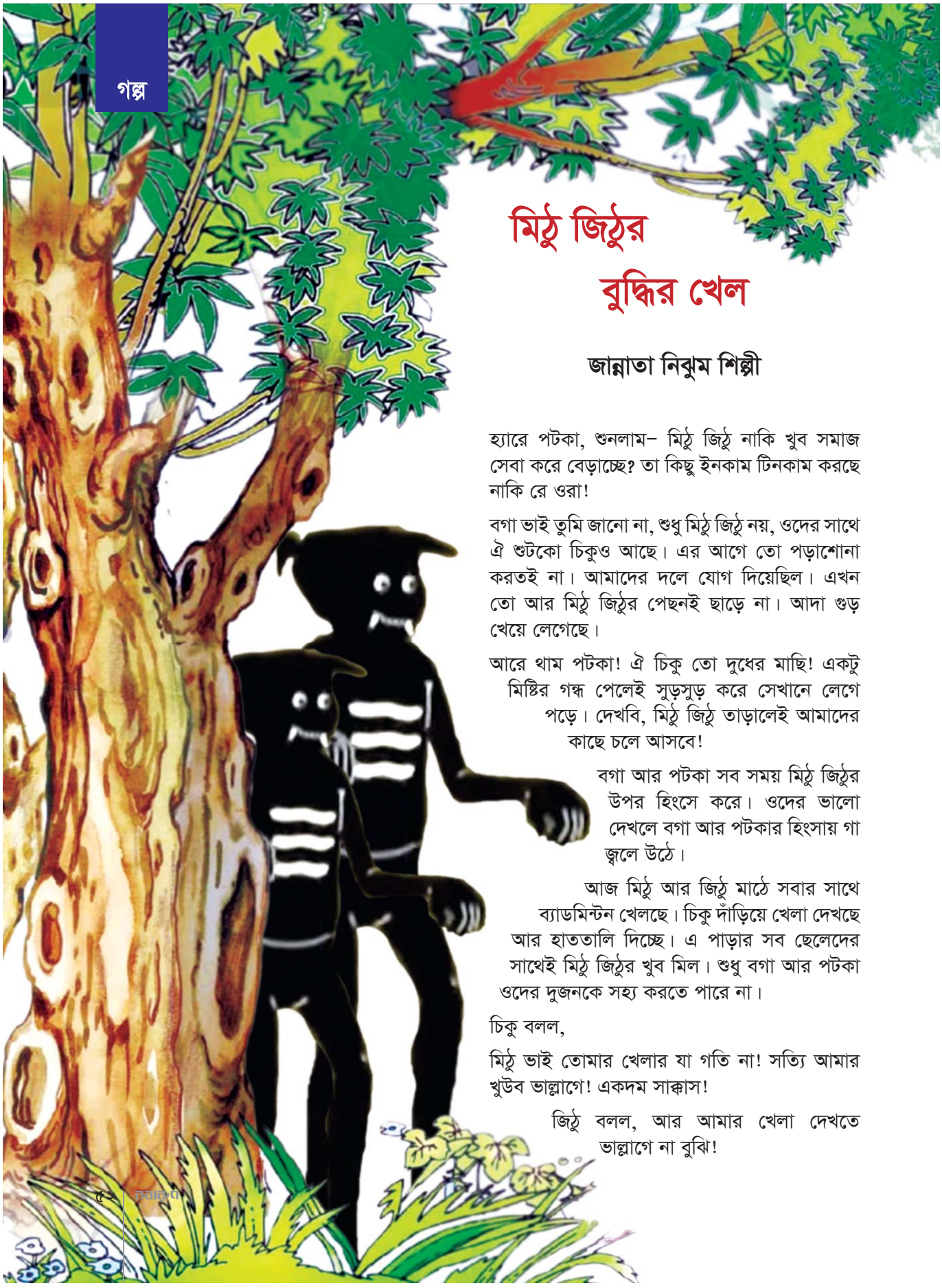

মিঠু জিঠুর বুদ্ধির খেল

জান্নাতা নিঝুম শিল্পী

হ্যারে পটকা, শুনলাম– মিঠু জিঠু নাকি খুব সমাজ সেবা করে বেড়াচ্ছে? তা কিছু ইনকাম টিনকাম করছে নাকি রে ওরা!

বগা ভাই তুমি জানো না, শুধু মিঠু জিঠু নয়, ওদের সাথে ঐ শুটকো চিকুও আছে। এর আগে তো পড়াশোনা করতই না। আমাদের দলে যোগ দিয়েছিল। এখন তো আর মিঠু জিঠুর পেছনই ছাড়ে না। আদা গুড় খেয়ে লেগেছে।

আরে থাম পটকা! ঐ চিকু তো দুধের মাছি! একটু মিষ্টির গন্ধ পেলেই সুড়সুড় করে সেখানে লেগে পড়ে। দেখবি, মিঠু জিঠু তাড়ালেই আমাদের কাছে চলে আসবে!

বগা আর পটকা সব সময় মিঠু জিঠুর উপর হিংসে করে। ওদের ভালো দেখলে বগা আর পটকার হিংসায় গা জ্বলে উঠে।

আজ মিঠু আর জিঠু মাঠে সবার সাথে ব্যাডমিন্টন খেলছে। চিকু দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে আর হাততালি দিচ্ছে। এ পাড়ার সব ছেলেদের সাথেই মিঠু জিঠুর খুব মিল। শুধু বগা আর পটকা ওদের দুজনকে সহ্য করতে পারে না।

চিকু বলল,

মিঠু ভাই তোমার খেলার যা গতি না! সত্যি আমার খুউব ভাল্লাগে! একদম সাক্কাস!

জিঠু বলল, আর আমার খেলা দেখতে ভাল্লাগে না বুঝি!

চিকু বলল, না! তা হবে কেন? তোমাদের দুজনের খেলাই আমার ভাল্লাগে। তোমরা দুজনেই গুড বয়।

ওদের কথা শুনে হাসল মিঠু।

মাঠের এক পাশে রাস্তা। লোকজন যাতায়াত করছে। কিছু ঝোপঝাড় গাছগাছালিও আছে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বগা আর পটকা ওদের খেলা দেখছে।

বগা বলল, মাঠে খুব আনন্দে খেলছ তোমরা! খেলো, এই রাতে আলো জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছ! খেলো। বাড়িতে যাওয়ার সময় বুঝবে মজাটা।

পটকা বলল, বগা ভাই কী করবে তুমি?

তুই শুধু আমার কথামতো কাজ করবি পটকা। তারপর আমি দেখছি!

বগা আর পটকা ভূতের মতো কালো লেজ ওয়ালা পোশাক পরল। তারপর গা ঢাকা দিল ঝোপের আড়ালে। আজ মিঠুরা এখান দিয়ে গেলেই ভয় দেখাব। তাহলে ওরা ভাববে ভূত আছে এখানে, ভয়ে আর ওরা এই মাঠে খেলতে আসবে না। হু হু কি মজা। সত্যি বগা ভাই তোমার মাথায় খুউব বুদ্ধি।

খেলা শেষ করে মিঠু জিঠু ও পাড়ার ছেলেরা বাড়ি ফিরছে এমন সময়, রাস্তার পাশে নিমগাছটার কাছ থেকে একটা শব্দ এল। ভূতের মতো আওয়াজ হচ্ছে। ঝোপগুলো নড়ছে। ছেলেপুলেরা ভয় পেয়ে এদিক সেদিক ছুটতে লাগল। সবাই বলতে লাগল,

এখানে ভূত আছে! আমরা আর এই মাঠে খেলব না।

মিঠু জিঠু সবাইকে সামলানোর চেষ্টা করল। চিকুটা ভয় পেয়ে মিঠুর কাঁধে চেপে বসল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মিঠু জিঠু বাড়ি ফিরল। পড়ায় মন বসল না।

গ্লাসে দুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে বলে গেলেন মিঠুর মা। কিন্তু দুজনেরই ঘুম হলো না। ব্যাপারটা নিয়ে পায়চারি করতে লাগল মিঠু।

রাত বাড়ছে, মিঠু জিঠুকে বলল, এখন ঘুমা।

পরের দিন আবার সবাই দল বেঁধে মাঠে খেলতে গেল। আজও বগা আর পটকা ভূত সেজে লুকিয়ে রইল গাছের আড়ালে। আবারও ভয় দেখাল ওরা। সবাই ভয় পেলে বগা আর পটকা খুশি হয়। এরকম ভূতের ভয় দেখানো চলতেই থাকল। সবাই মাঠে খেলা বন্ধ করে দিল ভূতের ভয়ে।

মিঠু বলল, এবার তো বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হয়।

আচ্ছা ভূত কি আমাদের উপর হিংসে করে এমন করছে?

জিঠু বলল, মিঠু ভাই এই মাঠে আমরা অনেকদিন ধরে খেলে আসছি। কোনোদিন তো ভূত আছে বলে সন্দেহ হয়নি। মানুষের মুখেও কোনোদিন শুনিনি। তাহলে ভূত আসলো কী করে?

মিঠু বলল, আমিও তাই ভাবছি। চিকু বলল,

এই কাজটা বগা আর পটকা করেনি তো? ওদের দুজনকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল, আজ সকালে দেখা হয়েছিল রবি চাচার দোকানে। আমাকে দেখে বগা বলল, শুনলান তোরা নাকি খেলার মাঠে ভূতের ভয় পেয়েছিস? দেখিস শুটকো, তোকে যেন তুলে নিয়ে না যায় আবার!

চিকুর কথা শুনে জিঠু চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, ওরা তো আমাদের ভালো দেখতেই পারে না। করতেও পারে। যাতে আমরা মাঠে আর খেলতে না যাই। তুই ঠিক বলেছিস চিকু। এটা ওদেরই কাজ।

মিঠু বলল, এই ব্যাপার!

প্রতিদিনের মতো আজও মিঠুরা মাঠে খেলতে এল। বগা আর পটকাও চুপি চুপি এল।

ওদেরকে খেলতে দেখে বগা বলল, আবার এসেছ! সোনারা। আজ এমন ভয় দেখাব! জীবনেও আর খেলতে আসবে না! ভূতের জমকালো পোশাকে বগা পটকা লুকিয়ে খেলা দেখতে লাগল।

এদিকে মিঠু দলবল সাথে নিয়ে আলাপ করল। আজ ভূত ধরবে ওরা। ভূত রোজ ওদের ভয় দেখায় আজ ওরা ভূতকে ভয় দেখাবে। ভয় পেলে চলবে না। ভয়কে জয় করতে হবে। সবাই রাজি হলো। হাতে একটা মশাল জ্বালিয়ে মিঠু জিঠু অন্য পাশ দিয়ে ভূত দেখতে গেল! দেখল দুটো ভূত ঝোপের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। মিঠু মনে মনে বলল, দাঁড়াও বাছাধন। এবার টের পাবে। আমাদের ভয় দেখানোর সাধ মিটাচ্ছি! লেজে আগুন ধরিয়ে দিল মিঠু। ওমনি দু'পা তুলে লাফাতে লাফাতে দৌড় দিল বগা আর পটকা! ঝাপ দিল পাশের পুকুরে। মিঠু আর জিঠুর বুদ্ধি দেখে সবাই হাততালি দিল। ■

মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত

রাকিব হাসান

বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্ক। লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন শব্দগুলো নিয়ে যেন অন্য এক দুনিয়ায় আছি। করোনা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের নির্দিষ্ট সময় পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে, ঘরে থাকতে হবে, বাইরে বের হলে মাস্ক পরতে হবে। আমাদের একটু সচেতনতাই পারে এই রোগ থেকে মুক্ত রাখতে। সেই সাথে ভালো চিন্তা করতে হবে, মনোবল বাড়াতে হবে। কেননা পৃথিবীতে এর আগেও বহু মহামারি এসেছে অবার নির্মূলও হয়েছে। আবার প্রতিষেধকও আবিষ্কার হয়েছে। তাই আতঙ্ক নয় সচেতন থাকতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে ভবিষ্যতের। করোনা শেষ হলে কোথায় যাব, কী কী করব, এইসব আর কী। তোমাদের ভাবনার শুরুটা আমি করে দেই। আজ সুন্দর একটা বেড়ানোর জায়গার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিব। যাদের গ্রামের বাড়ি খুলনা বা সাতক্ষীরা তাদের জন্য জায়গাটি হয়ত পরিচিত কিন্ত অনেকের কাছে নতুনও হতে পারে।

সাতক্ষীরা জেলায় বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে এক নয়নাভিরাম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত। যেন প্রকৃতির এক অপার সৃষ্টি। প্রকৃতির অপরূপা সুন্দরবন ও উত্তাল বঙ্গোপসাগরের এক রূপসি কন্যার নাম মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত। -যা এখনো কিছুটা অনাবিষ্কৃত। এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

সাতক্ষীরার বুড়িগোয়ালিনীর নীলডুমুর নৌ-ঘাট

সাফায়াত হোসেন, ২য় শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল মুগদা, ঢাকা

থেকে দূরত্ব আনুমানিক ৭৫ কি.মি.। নীলডুমুর পর্যন্ত গাড়িতে যাওয়া যায়, তারপর যেতে হবে ইঞ্জিন চালিত নৌকা বা স্পীড বোটে। এই ৭৫/৮০ কিলোমিটার পথ সুন্দরবনের বুক চিরে যাওয়া বিভিন্ন নদী। এই নদীগুলোর উভয় পাশেই দেখা যাবে চিরহরিৎ সুন্দরবনকে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এ যেন সবুজের রাজ্য। সুন্দরি, কেওড়া, বাইন, পশুর, গরান, গোলপাতা, সিংড়া, হেতাল, খলসী, গেওয়া গাছের সম্মিলনে এখানে ঘটেছে সবুজের মিলনমেলা। ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের শ্বাসমূল আর তাতে হরিণসহ নানা প্রাণীর ছুটে চলা মনকে বিমোহিত করে রাখবে। নয়ন ভরে দেখার মতো সে দৃশ্য। পানকৌড়ি আর বালিহাসের উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে এক সময় পৌঁছে যাবে মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতে।

একদিকে সুন্দরবন অপরদিকে বঙ্গোপসাগরের মায়াবী জলরাশি, কান পাতলেই শোনা যাবে গর্জন। প্রায় ৮ কিলোমিটার লম্বা মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত যেন ছবির মতো। অন্য সৈকতগুলো থেকে এটি একেবারেই আলাদা। অপূর্ব সৌন্দর্য ঘেরা এক জায়গা। পিছনে বাঘের ভয় আর সামনে অসম্ভব ভালো লাগার হাতছানি দেয়া সমুদ্র, সাথে সবুজ রহস্যে ঘেরা বন। হরিণ আর বাঘের পায়ের ছাপ সেই সম্মোহনকে আরো বাড়িয়ে দেবে কয়েকগুণ।

কীভাবে যাবে : ঢাকা > সাতক্ষীরা > নীলডুমুর > মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত। ঢাকার শ্যামলী থেকে সাতক্ষীরার বাস ধরে সাতক্ষীরা/শ্যামনগর। ঢাকা থেকে সাতক্ষীরার দূরত্ব ৩৪৩ কিলোমিটার। সাতক্ষীরা সদর থেকে বুড়িগোয়ালীনি ৭০ কি.মি.। ইঞ্জিন চালিত নৌকা, স্টিমার, বোটে করে শীত মৌসুমে সময় লাগবে ৬/৭ ঘণ্টা। ■

বাবা দিবস উপলক্ষ্যে

সকল বাবাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

মেজবাউল হক

বাবা, খুব ছোট্ট একটি শব্দ। অথচ তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে হাজারো দায়িত্ব আর অগাধ ভালোবাসা। এই ছোট্ট শব্দের মানুষটিকে নিয়ে হাজারো শব্দ লিখলেও তার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া দুর্বোধ্য। হ্যাঁ, বন্ধুরা তিনিই আমাদের 'বাবা'।

প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রোববার বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব বাবা দিবস। বাবার মাধ্যমেই সন্তানের জীবনের শুরু। সন্তান বাবার ঋণ কখনো পরিমাপ করতে পারে না। বাবা পরিবারের মহীরুহ হয়ে দায়িত্ব পালন করেন সবসময়। শাসনে কঠোর, ভালোবাসায় কোমল, স্নেহে উদার, ত্যাগে অগ্রগামী বাবা, যিনি জন্মদাতা। বাবার প্রাপ্য সম্মান প্রদানে একদিন কিছু নয়। তবুও শুধুই বাবার জন্য একটি দিন, একটু আলাদা করে উদ্‌যাপন করতেই 'বাবা দিবস'।

বাবা হলেন অদ্বিতীয় আলো, যার আলোয় আলোকিত হয়েই আমাদের সারাজীবনের পথচলা। তবু সন্তানেরা বড়ো হয়ে কর্মব্যস্ততায়, লেখাপড়া ও নানা কাজের চাপে বাবা-মাকে সময় দিতে পারে না। কেউবা প্রবাসে, কেউবা বাবাকে গ্রামে রেখে শহরে পাড়ি জমায়। আর তাই বাবার জন্য বিশেষ একটা দিন মাত্র।

বাবারা যে-কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট একাই সহ্য করেন। সব সময় চেষ্টা করেন দুঃখ-কষ্ট যেন সন্তানদের স্পর্শ না করে। সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। 'বাবা দিবস' পালন শুরু হয় গত শতাব্দীর প্রথমদিকে। পৃথিবীর সব বাবাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছা থেকে যার শুরু।

১৯শে জুন, ১৯১০। প্রথম বাবা দিবস উদযাপিত হচ্ছে স্পোকেনস শহরে। শহরের ছেলেমেয়েরা দুটি করে গোলাপ নিয়ে যাচ্ছিলেন চার্চে। একটি লাল, অন্যটি সাদা। লাল গোলাপ জীবিত পিতাদের শুভেচ্ছার জন্য, আর সাদা গোলাপ মৃত পিতাদের আত্মার তুষ্টির জন্য। বিষয়টি পুরো মার্কিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'বাবা দিবস' পালন শুরু হয়। অবশেষে ১৯৬৬ সালে ৫৬ বছর পর বাবা দিবসকে দেওয়া হয় জাতীয় মর্যাদা ।

নবারুণের বন্ধুরা, বাবাকে অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসা জানাতে দিতে পারি উপহার। হতে পারে বাবাকে নিয়ে লেখা কবিতা, হতে পারে একটি ফুল। কিন্তু বাবারা উপহার পেতে নয় দিতেই ভালোবাসেন। বাবার খুশিই আমাদের পরম পাওয়া। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সকল বাবাকে। ■

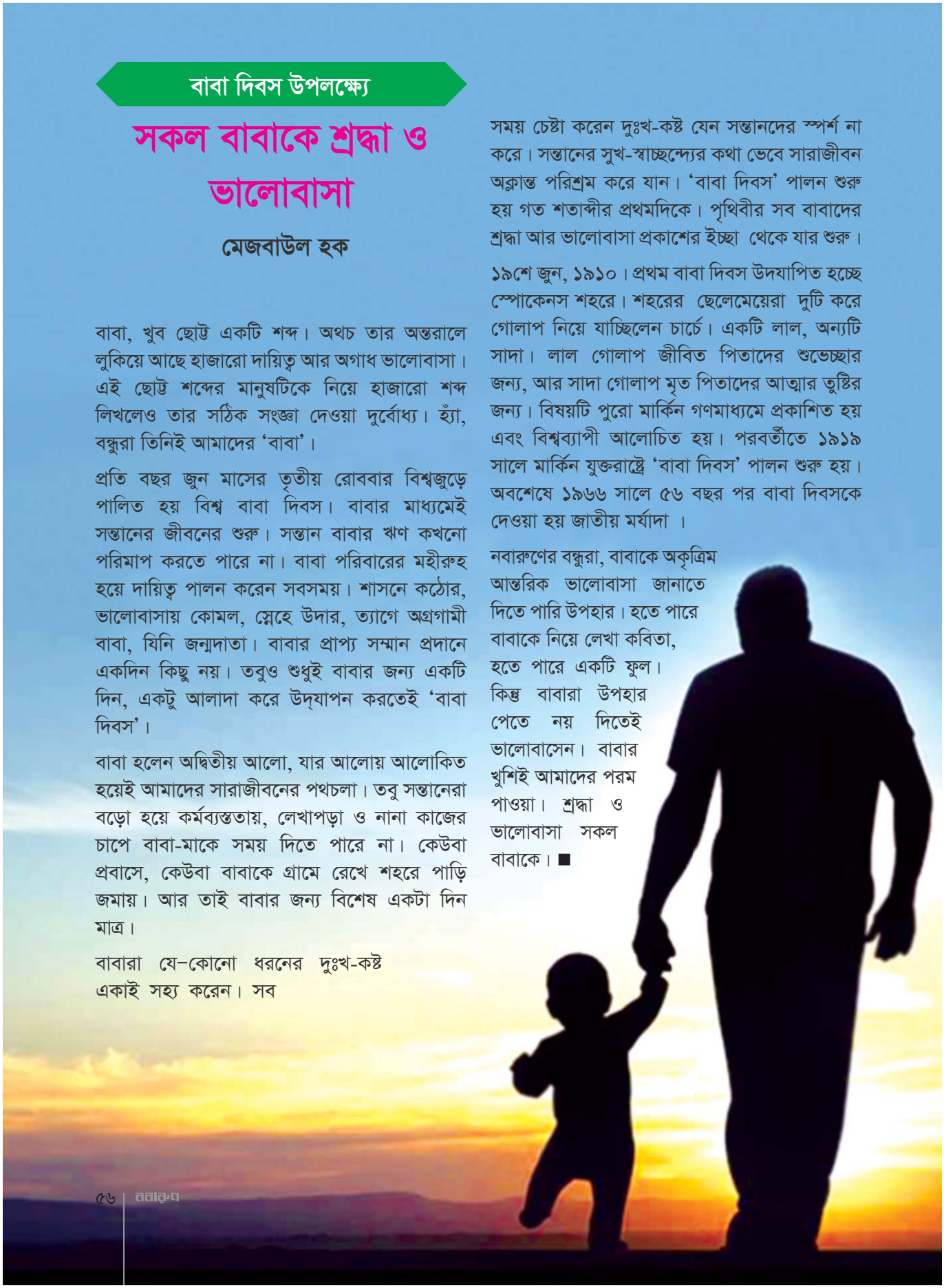

করোনা রোগীর পথ্য

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। ভাইরাসটি ঠেকাতে দেশে দেশে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে নিজে ও জনগণকে কীভাবে সচেতন করা যায় সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করা। তাছাড়া যেহেতু এই ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কার হয়নি। তাই করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি দরকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। তাই দরকার ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ট্রেস এলিমেন্ট। বিভিন্ন ভিটামিনের মধ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন ডি।

এছাড়া যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা অন্যান্য জটিল রোগ, যেমন- ডায়াবেটিক, হৃদরোগ ও অ্যাজমা রোগীদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এ জন্য তাদেরকে থাকতে হবে সচেতন। মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি।

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন তিন বা চার ধরনের শাকসবজি এবং কমপক্ষে দুইটি ফল খেতে হবে। আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করতে হবে। এর সাথে নিয়ম করে শরীর চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

এ সময় ভিটামিন সি যুক্ত খাবারগুলো যেমন- আমলকি, পেয়ারা, লেবু, কমলা, আনারস, বেদানা প্রতিদিন খেতে হবে। এছাড়া ঢ্যাঁড়স, পটল, মিষ্টি কুমড়া, শিম, গাজর, বাঁধাকপি, কলমিশাক, ক্যাপসিকাম, বরবটি, কড়াইশুটি, পেয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ প্রভৃতি পুষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে। দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার, যেমন- টকদই ও ছানা সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষমতা বাড়ায়।

করোনার ঝুঁকি কমানোর জন্য শিশুদের সঠিক পুষ্টি

নিশ্চিত করা জরুরি। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে এমন খাদ্য নির্বাচন করতে হবে, যাতে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

এছাড়া লকডাউনে বাড়িতে থাকার কারণে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কিছুটা কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়া দরকার। না হলে অতিরিক্ত ক্যালরি ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার যেমন– ভাত, রুটি, মুড়ি, চিড়া, সুজি পরিমাণে কম খাওয়া উচিত। তবে এ সময় সালাদ, ফল, স্যুপ, ছোলা, মুগডাল, বাদাম খাওয়া যেতে পারে।

সকালে উঠে অল্প গরম পানি আর এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে গলার সমস্যা দূর হয়। একই সাথে সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অনেক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। কাঁচা হলুদ না থাকলে রান্নায় ব্যবহৃত খাঁটি গুড়ো হলুদ গরম পানিতে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ঘরে বসে বাইরের অর্ডার ফুড বাদ দিতে হবে। অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, ভাজাপোড়া খাবার, বাইরের খাবার বা রাস্তার খাবার অবশ্যই বাদ দিতে হবে। খাবারের পাশাপাশি প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম খুব জরুরি। এছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তো আছেই। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যদি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার থাকে তবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। কারণ অসুস্থ হওয়ার আগে রোগ প্রতিরোধ জরুরি। ■

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে তিন (৩) ফুট দুরত্ব বজায় রাখুন।

বার বার সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধোবেন। অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে মুখ, নাক ও চোখ ছোবেন না।

জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হলে বাড়িতেই আলাদা থেকে চিকিৎসা নিন।

এসএসসি'র ফলাফলে মেয়েরা এগিয়ে

জান্নাতে রোজী

এসএসসিতে ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভালো ফল করে আসছে। এবারও মেয়েরা সেই শ্রেষ্ঠত্বের ধারা অব্যাহত রেখেছে। পাশের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে আছে আমাদের মেয়েরা। ৩১শে মে প্রকাশিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে এ তথ্য পাওয়া যায়।

২০২০-এ এসএসসি'র প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, নয়টি শিক্ষাবোর্ডে গড়ে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৯৭ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে মেয়েদের পাশের হার ৮৪ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর ছেলেদের পাশের হার ৮২ দশমিক ৯৫ শতাংশ। আর নয়টি শিক্ষাবোর্ডে প্রায় ৬৪ হাজার ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

মেয়েদের এগিয়ে থাকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, প্রথমত মেয়েরা পড়াশোনার প্রতি বেশি মনোযোগী এবং ঘরমুখী। দ্বিতীয়ত, সমাজব্যবস্থা এখন পরিবর্তন হচ্ছে। বাবা-মায়েরা এখন ছেলেমেয়েকে আলাদা করে দেখে না। ছেলেমেয়ে উভয়ই সমান সুযোগ পাচ্ছে। আর এটির প্রভাব পড়ছে শিক্ষায়।

বাল্যবিবাহ বন্ধে তিনজনের সাজা

করোনাকালীন এ দুর্যোগের সময় সবাই যখন কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে– ঠিক তখনি এই সময়ে এক অসচেতন বাবা লুকিয়ে আয়োজন করেছিল ১১ বছরের কন্যার বিয়ের। কিন্তু প্রশাসনের সজাগ তৎপরতার কারণে বাবার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। বাল্যবিবাহের দায়ে বরকনের বাবা এবং কাজির এক সহকারীর সাজা হয়েছে।

ঢাকার ধামরাইয়ের নওগাঁও গ্রামের ২২ বছর বয়েসি রনির সঙ্গে মানিকগঞ্জের ১১ বছর বয়েসি এক শিশুর বিয়ের আয়োজন চলছিল মাইক্রোবাসের ভেতর। পুলিশ খবর পেয়ে বরকনের বাবা ও কাজির সহকারীকে আটক করে।

বর রনি আহমেদকে এক মাস ও কনের বাবাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং কাজির সহকারী মামুনুর রশিদকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুই মাসের কারাদণ্ড দেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত। ■

দশদিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জয়

নিজের ইচ্ছা পূরণে যদি থাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস তাহলে তা পূরণে কোনো প্রতিবন্ধকতাই বাধা হতে পারে না, তাই না বন্ধুরা। তেমনি এক জন বন্ধু দুর্গাপুরের নাগেরগাতি গ্রামের মাসুদুর রহমান লাদেন। জন্ম থেকেই তার দুটি হাত নেই। কিন্তু লেখাপড়ায় তার আগ্রহ প্রবল। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সে জিপিএ ৩.৬৭ পেয়েছে, স্থানীয় নবারুণ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। লাদেনের স্বপ্ন বড়ো হয়ে কোনো ফুটবল ক্লাবে প্রতিবন্ধী কোটায় খেলা। পড়াশোনা শেষ করে সরকারি চাকরি করতে চায় লাদেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম ও খেলাধুলায়ও পিছিয়ে নেই সে। আর এভাবেই লাদেন করছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জয়।

করোনায় ভরসা বাইসাইকেল

করোনা শুধু জনজীবন নয়, যান জীবনটাও বদলে দিয়েছে। করোনা আতঙ্কের মাঝেও জীবন থেমে নেই। জীবিকার প্রয়োজনে ছুটছে সবাই। ডাক্তার-নার্স, সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ। বর্তমান স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে চলাচলের জন্য এখন মানুষের পছন্দের মধ্যে রয়েছে বাইসাইকেল। কেউ বের করে নিচ্ছেন নিজের পুরনো সাইকেলটি, আবার অনেকেই ভিড় জমাচ্ছেন সাইকেলের দোকানে। পরিবেশবান্ধব বাহন হিসেবে সাইকেল আগে থেকেই জনপ্রিয়। করোনার সংক্রমণ এড়িয়ে নিরাপদে চলতে এখন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাইসাইকেল।

স্পর্শ ছাড়া হাত ধোয়া মেশিন

বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে করোনা। করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন বার বার হাত ধোয়া। এই মহামারির মধ্যে হাতের স্পর্শ ছাড়া হাত ধোয়ার মেশিন বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কেনিয়ার এক বন্ধু। নাম স্টিফেন ওয়ামুকোটা, বয়স ৯ বছর।

স্টিফেনের এই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনের জন্য তাকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। স্টিফেন কেনিয়ার পশ্চিম অংশের বুনগোমা এলাকার বাসিন্দা। সে কাঠ, পেরেক আর ছোট্ট একটি পানির ড্রাম দিয়ে তৈরি করেছে এই হাত ধোয়ার মেশিন। যেটি ব্যবহার করার জন্য হাত দিয়ে মেশিন স্পর্শ করার প্রয়োজন নেই। যন্ত্রটিতে দুটি প্যাডাল আছে। একটিতে পা দিয়ে চাপ দিলেই তরল হ্যান্ডওয়াশ বেড়িয়ে আসে। অন্যটিতে চাপ দিলে একটি ড্রাম থেকে পানি বের হয়। নিচে রয়েছে একটি প্লাস্টিকের গামলা। হাত ধোয়া পানি গামলা হয়ে পাইপ দিয়ে দূরে চলে যায়।

ঘোড়ার পিঠে রানি এলিজাবেথ

৯৪ বছর বয়সি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কোয়ারেন্টাইন শেষে প্রথমবার আন-অফিশিয়াল মেজাজে হাজির হয়েছিলেন। উইন্ডসর ক্যাসেলের বাইরে ১৪ বছর বয়সি একটি ঘোড়ায় তাকে চড়তে দেখা যায়। গায়ে ছিল জ্যাকেট, লম্বা প্যান্ট ও জুতো। মাথায় জড়ানো রঙীন স্কার্ফ। রানি এলিজাবেথ এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় টিকে থাকা শাসনকর্তা। আর ঘোড়ায় চড়াতো রানির নিত্যদিনের একটি পছন্দের রুটিন।

আঁকা ছবি

মো. জাওয়াদ হোসেন, ৭ম শ্রেণি, লিটল অ্যাঞ্জেল স্কুল, গাজীপুর।

সাজিদ হোসেন, ৭ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ইথিওপিয়ার রাজধানী, ৩.ইরাকের রাজধানী, ৫.ভুল, ৬. পুরুষ শিশু, ৮.শিষ্টাচার, বিহ্বল এর কোমল রূপ, ১০.পাখির বাসা, ১২.আঙুলের অগ্রভাগে হাতের একটি উপাস্থি, ১৩.জনসাধারণকে বিশেষভাবে জানানো

উপর-নিচ: ১. বাকু কোনো দেশের রাজধানী, ২.তুরস্কের রাজধানী, ৪.সাহায্য, ৭.উপনিবেশ, ৯.চড়ুইভাতি

১.			২.		৩.	■	৪.
	■	■		■	৫.		
	■	■		■		■	
৬.		৭.	■	৮.		৯.	■
	■		■	■	■		■
	■	১০.		■	১১.		
১২.		■	■	■	■		■
■	■	■	১৩.				■

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত:

সালোক সংশ্লেষণ, বালকবেলা, বিষয়, বাতায়ন, লালমাটি, মানুষ, সহায়

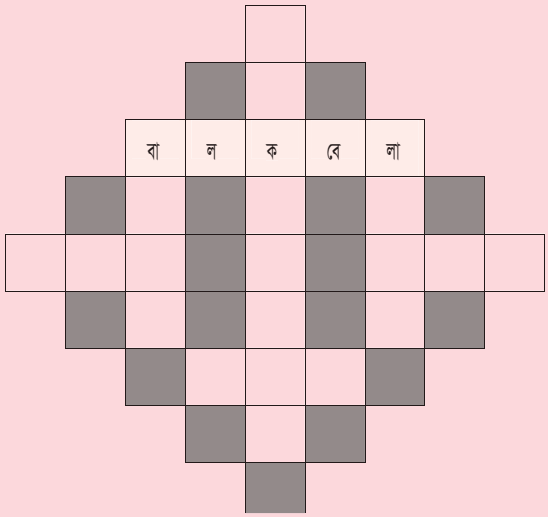

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৪	*		-	৫	=	
+	■	*	■	+	■	+
	+	১	-		=	০
-	■	+	■	-	■	+
১	*		-	২	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৬	-		=	৫

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৩		১		৭৭		৬৩		৬১
	৯		৭৫		৭৯		৬৫	
৫		১১		৮১		৬৯		
	৭		৭৩		৭১	৬৮	৬৭	
১৯			৪০				৪৪	
	১৭				৩৩	৪৬		
		১৫		৩৫				৫৫
	২৫		৩৭				৫৩	
২৩		২৭			৩০	৪৯		৫১

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

মে ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

আ	ই	ই	ডি	সি	আ	র	
	তি		সে			চ	র
	হা		ম্ব			য়ি	
মা	স		র		সে	তা	র
লি				প			
কা	ক	তা	লী	য়			বা
না		গি		ম	য়	দা	ন
		দ		ন্ত			র

ছক মিলাও

			আ					
			জা					
		আ	গ	র	বা	তি		
		লো		বা			বা	
পা	ল	ক		ই	তি	বা	চ	ক
		ব		জা			ক	
		র্ষ		ন	জ	র		
				ল				

ব্রেইনইকুয়েশন

৩	*	৪	-	৭	=	৫
*		*		-		+
২	*	১	+	৬	=	৮
-		-		+		-
৫	*	২	-	৮	=	২
=		=		=		=
১	*	২	+	৯	=	১১

নাম্ব্রিক্স

৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৩১	৩০	২৯	২৬	২৫
৫৮	৬১	৬২	৫৩	৩২	৩৩	২৮	২৭	২৪
৫৯	৬০	৬৩	৫২	৩৫	৩৪	২১	২২	২৩
৬৬	৬৫	৬৪	৫১	৩৬	৩৭	২০	১৭	১৬
৬৭	৭০	৭১	৫০	৪৯	৩৮	১৯	১৮	১৫
৬৮	৬৯	৭২	৪৭	৪৮	৩৯	১২	১৩	১৪
৭৯	৮০	৭৩	৪৬	৪১	৪০	১১	২	১
৭৮	৮১	৭৪	৪৫	৪২	৯	১০	৩	৪
৭৭	৭৬	৭৫	৪৪	৪৩	৮	৭	৬	৫

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh
Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-12, June 2020, Tk-20.00

ঋতুর বৈচিত্র্যতায় অপরূপ সাজে
প্রকৃতি যে সেজেছে আজ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা